অশান্ত ঘূর্ণী

শ্রীস্বপনকুমার

ক্রাইম এণ্ড মিষ্ট্রি সিরিজ—২নং

অশান্ত ঘূর্ণী

শ্রীস্বপন কুমার

—: প্রকাশক :—

অমরেন্দ্র নাথ দাস

৬এ. রাজেন্দ্রকিশোর দে লেন, কলিকাতা-৫

সন ১৩৭৫ সাল

মূল্য— ৫

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত।

উপন্যাস :

মিলন বাসর	৩-৫০
গোধূলি লগ্নে	৩-০০
আশীর্বাদ	৩-৫০
মনে রেখো	৩-০০
দুটি হৃদয়	৪-০০
প্রজাপতির নির্বন্ধ	৪-০০
বধূর মিলন	৪-০০
শুভদৃষ্টি	৪-০০
অপরিচিতা	৪-০০
মিলন বীণা	৪-০০
রাজমহল	৪-০০
লক্ষ্মী এলো ঘরে	৪-০০
সোনার প্রতিমা	৪-০০
ফুলশয্যার রাতে	৪-০০
রাজযোটক	৫-০০
মজনু মহলের বেগম	৫-০০
দ্বিজেন্দ্র গুপ্ত	
ঠাকুরমার ঝুলি	৬-০০
রূপকথার দেশ	৬-০০
ঠাকুরদার ঝুলি	৬-০০
বাংলার রূপকথা	৬-০০
যাদু রহস্য	৪-৫০
হৃদয় ব্যাধিক	৫-০০
অরণ্যের বিভীষিকা	৩-৫০
কঙ্কর মন্ত্রী	৩-৫০
বাগদাদ হারেমের কান্না	৩-৫০
ডিটেকটিভ	১-৬০ হিঃ
নকুল কৃষ্ণা	
অশান্ত ঘূর্ণি	
মায়াজাল	১-৬০ হিঃ
সাপের চোখ নীল	
ফেরারী আসামী	
রক্ত-রাঙা পথ	
Child's A, B, C,	1-[illegible]
Lovely A, B, C,	1-70
আদর্শ লিপি	১-০০

স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত নাটক

যাত্রী	৩-০০
রক্তপিপাসু হায়না	৩-০০
কালের বিচার	৩-০০
রক্তের টান	৩-০০
দেশের শত্রু	৩-০০
কালো মানুষ	৩-০০
বিক্ষুব্ধ জনতা	৩-০০
কঙ্কালের অট্টহাসি	৩-০০
দুঃখে যাদের জীবন গড়া	৩-০০
কয়েদী উধাও	৩-০০

পঞ্চমাংক নাটক :

প্রসাদ ভট্টাচার্যের—

রোশনী মহল	৫-৫০
শয়তানের হাসি	৫-৫০
ফেরারী বাদশা	৫-৫০
রক্তে রাঙা গোলাপবাগ	৫-৫০
জালিম সিংহের মাঠ	৫-৫০
পাষাণের চোখে জল	৫-৫০

অনিল দাসের—

মুঘল হারেমের ফৌজ	৫-৫০
কৈফিয়ৎ	৫-৫০
কালাদীঘির ডাকাতি	৫-৫০

॥ এক ॥

হাসলে চপলাকে সত্যিই সুন্দর দেখায়।

তাই অতটা অমত থাকলেও বৌদি তাকে বাধা দিতে পারলেন না। চপলা হেসে বললে—তুমি বড় ভীরু বৌদি। কি আর এমন সময় লাগবে? এখান থেকে হাজারীবাগ—এমন দূরের পথ কিছু নয়। যাব আর আসব—থাকব বড় জোর দিন তিনেক। এতে ভয় পাবার কি আছে? দাদা এলে বলো, চপলা জোর করে চলে গেছে।

বৌদি কিছু বলবার আগে চপলা হুস করে স্টার্ট হয়ে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু সে কি আর তখন জানত, বিপদ এসে এমনি করে তার সামনে হাজির হবে?

বেশ স্পীডেই গাড়ি চালাচ্ছিল চপলা। চালাতে চালাতে যেন তার হাসি পাচ্ছিল। বিগত দু-তিনটি মাসের দুঃখ গ্লানি কিছুই ছিল না তার মনে সব কিছু যেন ভুলতে বসেছিল এই গাড়ির মধ্যে। মাইল ত্রিশ চল্লিশ বোধ হয় পার হয়ে এসেছিল সে।

তারপর হঠাৎ গাড়ি গেল বন্ধ হয়ে। চপলা এর জন্যে তৈরী ছিল না। গাড়ি যে এভাবে বন্ধ হয়ে যাবে, সে কল্পনাও করতে পারেনি।

একটু বিস্মিত হলো সে।

গাড়ির সব পার্টস ঠিকঠাক আছে। পেট্রলও আছে ট্রাক বোঝাই। তাহলে গাড়ি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন?

চপলা আবার চেষ্টা করলে গাড়ি স্টার্ট করতে কিন্তু বৃথা চেষ্টা। গাড়িটা যেন তার সঙ্গে অসহযোগ করতে চেষ্টা করেছে। চপলা গাড়ি থেকে নেমে কোথায় কি ত্রুটি হয়েছে তা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করল। বনেট খুলে অনভ্যস্ত চোখে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কোনও কিছু তার চোখে অস্বাভাবিক বলে মনে হলোনা। আবার উঠে গিয়ে সে গাড়ি স্টার্ট দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু গাড়ি ঠিক পূর্ববৎ।

এখন উপায়?

অসহায় ভাবে সে চারিদিকে তাকাতে লাগল। কাছাকাছি কোন লোকালয়ে তাকে থাকতে হবে আজকের মত।

সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। সন্ধ্যা নামতে বড় জোর ঘণ্টা খানেক বাকি। এই অবস্থায় গাড়ি ঠেলে কাছাকাছি কোথাও নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া কোথাও লোকালয় আছে বলে মনে হয়না।

চপলা একটু হতাশ হলো।

যাক্। এই পথের উপরে নিজেকে যেন একা মনে করল।

দুপাশে জঙ্গল আর গাছপালা—মাঝ দিয়ে চলে গেছে পিচ ঢালা পথ। দূরে হয়তো দু-চার মাইল পরে লোকজনের বসতি। কিন্তু সেখানে এখন আশ্রয় পাবার আশা দুরাশা মতো। কোন দিকে লোকালয় আছে না জেনে আন্দাজে হাঁটতেও পারে না।

মনে হলো দূরে একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল।

চপলা ভাল করে চেয়ে দেখল। সত্যিই দূরে একটা গাড়ি এদিকে ছুটে আসছে।

চপলার মনে আশার সঞ্চার হলো।

যাক, এই নির্জন পথের উপরে নিজেকে যতটা অসহায় মনে করছিল ততটা নয়—নিশ্চয়ই এই গাড়িতে দু-এক জন লোক আছে—তাদের কাছ থেকে সাহায্য মিলতে পারে। ধীরে ধীরে গাড়িটা এগিয়ে এলো।

অবশেষে তার গাড়ির পাশে এসে সেটা দাঁড়িয়ে পড়ল। নিশ্চয়ই গাড়ির পাশে একা একটি নারীকে দেখে কৌতূহলী হলো সে।

ঐ গাড়িতে আরোহী মাত্র একজন। পরনে স্যুট, মাথায় টুপি চপলাকে দেখে গাড়ির আরোহী গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এলো। চপলার মনে ভরসার সঞ্চার এলো আর একটি জ্যান্ত মানুষকে দেখে।

চপলার চোখ পড়ল আরোহীর দিকে। নিজের অজ্ঞাতেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আপনি!

এ গাড়ির আরোহীর মুখ থেকেও বেরিয়ে পড়ল দুটি কথা—মিস বোস! আপনি এখানে?

চপলা চিনতে পারে। সে এই অমল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ভেসে ওঠে কয়েকটি—দৃশ্য—তার বাবা মিঃ বোস কমলেশ···অমলদের সঙ্গে অমলের দ্বন্দ্ব—তার বাবার অমলের প্রতি নির্দয় ব্যবহার।

অবশেষে তার মনে জেগে ওঠে একটি ছবি। করুণ কিন্তু জীবন্ত সত্য। পিস্তলের গুলিতে মিঃ গুপ্তের মৃত্যু। গড়ের মাঠের ধারে পড়ে থাকে। সেই মৃতদেহ দেখে চপলা মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। অনেকেরই

সন্দেহ হয়েছিল মিঃ গুপ্তের মৃত্যুর জন্যে অমল দায়ী—কিন্তু চপলা বিশ্বাস করেনা। নিরুদ্দেশের পর থেকে আজ পর্যন্ত কেউ তার খবর পায়নি। এতদিন পরে তার সাথে দেখা হলো পথের ধারে।

মিঃ গুপ্তের মৃত্যুর একটি মাস পরে তার বাবা নিখোঁজ হলেন। একদিন ক্লাবে গিয়ে আর ফিরলেন না। পুলিশ সন্দেহ করে তার বাবা মৃত। আর এই মৃত্যুর জন্যে দায়ী অমল।

সে কিন্তু বিশ্বাস করেনি। অবশ্য তার ধারণা যাই হোক, তা দিয়ে পুলিশ বিভাগের কাজ চলেনা। তারা এ নিয়ে অনেক তদন্ত করেছে—কিন্তু মিঃ বোসের কোনও খবর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মৃত্যুর বিষয়ে স্থির না জেনে পুলিশ বিভাগ আর এগোতে পারেনি। চপলা কিন্তু গোপনে এই কেসের ভার তুলে দিয়ে ছিল বিখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর কাছে। দীপক এখনও কোনও মতামত প্রকাশ করেনি।

তবে সে আশা করেছে নিশ্চয়ই সে সন্ধান করতে পারবে।

চিন্তাগুলি ঝড়ের বেগে তার মাথার মধ্যে পাক খেয়ে যায়।

অমল কি সত্যিই নির্দোষ না তার বাবার দেওয়া আঘাতের রূঢ় প্রতিশোধ সে গ্রহণ করতে চেয়েছে নির্দয় ভাবে। কোনও কথাই ভেবে স্থির করতে পারে না চপলা।

—মিসেস বোস। অমল আবার ডাক দেয়।

চপলা যেন সম্বিত ফিরে পায়। ধীর কণ্ঠে বলে—হ্যাঁ। দেখুন তো গাড়িটা চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেল।

—আপনি যাবেন কোথায়?

—হাজারীবাগ।

—বেড়াতে ?

—হ্যাঁ।

—একা বের হয়েছিলেন কেন ?

—তাছাড়া উপায় কি ? দাদা কাজে ব্যস্ত বাবাও নেই জানেন।

—মিঃ বোস নেই ? মানে ?

অমল যেন চমকে ওঠে কথাটা বলে।

—মানে আমি কি বলব ? দু—তিন মাস তার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি।

অমল তাকায় চপলার দিকে। বেশ ভাল করে তাকায়।

না চপলা অবিবাহিতা—এখনো তার সীমন্তে সিঁদুর হীন।

কোনও কথা আর বলে না অমল সোজা গিয়ে তার গাড়িটা খুলে বেশ পরীক্ষা করতে থাকে। মিনিট কয়েক পরে মুখ তুলে বলে —এখন এ মেরামত সম্ভব নয়। অনেকটা সময় লাগবে প্রায় দু' ঘণ্টা। কিন্তু এই আঁধারেও তা সম্ভব নয়।

—কিন্তু গাড়িটা ত ফেলে রেখে যেতে পারি না।

—তা ঠিক।

—তা হলে উপায়।

—আপনি গাড়িতে বসুন মিঃ বোস। আমি বরং কাছাকাছি কোন লোকালয় আছে কিনা দেখে আসি।

—থ্যাঙ্কস।

অমল চলে যায়।

চপলা গাড়িতে বসে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে।

* * *

এক ঘণ্টা পরে অমল ফিরে আসে।

বলে—এক মাইল হাঁটতে পারবেন ?

—হ্যাঁ।

—এক মাইল দূরে একটি গ্রাম্য বসতি আছে। তার মধ্যে এক জন সাধারণ গ্রাম্য বৃদ্ধ তার বাড়ীতে রাতের মত থাকতে দিতে রাজি হলো।

—বেশ চলুন।

—আমি এখানেই গাড়ীতে থাকব রাতের মত।

—কিন্তু গাড়ী বন্ধ করে রাখলে অসহ্য গরম হবে, আর মুখ খুলে রাখলে মশার চোটে টিকতে পারবেন না।

—আচ্ছা সে পরে ঠিক করা যাবে।

দুজনে কথা বলতে বলতে এগোলো।

হঠাৎ চপলা কিসে হোঁচট খেলো।

অমল হাতের টর্চ টা জ্বালালো। একটা হাই পাওয়ারের টর্চ সব সময়ে অমলের সঙ্গে থাকে অন্ততঃ সে যখন বাহিরে বেরোয়। চপলা তা জানত।

চপলা মনে মনে হাসে।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস।

অমলকে সে একদিন কতটা বিশ্বাসই না করত। অথচ মাঝের কতগুলি মাসে কি যে ওলোট পালোট হয়ে গেল।

আজকে আবার সেই অমলকেই যে বিশ্বাস করছে—বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। অবশ্য অমলকে বিশ্বাস করে সে কোনও দিন ঠকেনি। চপলা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে।

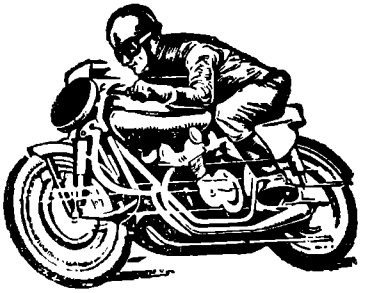

॥ দুই ॥

লোকালয়ে পৌছবার কিছু আগে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে থাকে।

কিছুক্ষণ আগেই আবছা টুকরো টুকরো মেঘে ছেয়ে গেছিল। এখন বৃষ্টি নামতে দেখে অমল বললে—জোরে পা চালান মিস্ বোস। কথাটা চপলার কানে বাজে।

মাস ছয়েক আগে চপলাকে মিস বলে ডাকতেন। অথচ আজ—একি বিরাট পরিবর্ত্তন।

অমলা বললে—হ্যাঁ চলুন।

দুজনে দ্রুত পা চালিয়ে লোকালয়ের সামনে এসে পৌছায়।

লোকালয় বলতে কিছু দূরে দূরে চার—পাঁচটি টিনের ঘর।

যে ঘরটির সামনে এসে চপলা দাঁড়াল তার চেহারা দেখে চপলার কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

টিনের চাল দেওয়া একটি ঘর আর বারান্দা।

চপলা বললে—না। এখানে থাকার চেয়ে গাড়িতে শুয়ে থাকা ভাল।

অমল বললে—আপনি ত তখন বললেন গাড়িতে শুলে গরম আর মশা লাগবে।

—তা ঠিক।

—অগত্য এখানেই থাকুন গৃহস্বামী সংলে আর গৃহস্থ বলে মনে হয়।

অগত্যা চপলা ভেতরে গেল।

একজন হিন্দুস্থানি সম্বর্ধনা জানিয়ে বললে—আইয়ে মেম সাব, আইয়ে সাব।

অমল বললে—মেমসাব ভেতরে থাকলে তাহলে তুমি কোথায় শোবে?

লোকটি বললে—ম্যয়, ওঁ বাহার মে থা রহা হুঁ। এক ঘণ্টা বাদ ওয়া পাশ আকে বাহার মে শো যায়েগা।

অমল বললে—তুমকে বহুত সুক্রিয়া। লোকটি বেরিয়ে গেল।

অমল বললে—আপনি শোবার ব্যবস্থা করুন আমি চলি।

চপলা বললে—না।

—কেন?

—আপনিও ত লোকটির সঙ্গে বারান্দায় শুতে পারেন।

—মশার ত উৎপাত কম নয়—আর একমাত্র মশারীটি ত ঘরে। গৃহস্বামী না হয় আপাদ মস্তক চেপে বারান্দায় শুয়ে রাত কাটবে—কিন্তু আমার ত তা সম্ভব নয়। তার চেয়ে গাড়ি বন্ধ করে একটু গরমের মধ্যে রাত কাটানো ভাল।

—কিন্তু এখানে একা!

—ভয় নেই আসে পাশে আরও বাড়ী আছে। তাছাড়া গৃহস্বামীকে দেখে ভাল বলে মনে হয়। সে রাত নটায় মধ্যেই ফিরে বাইরে শোবে। একটু সাহস না থাকলে একা বাইরে বের হলেন কেন?

অগত্যা চপলা চুপ হয়ে থাকে।

অমল বলে—কি ভাবছেন?

চপলা বললেন—আমি একা শুতে ভয় পাইনা—তবে আপনার ত এখানে কষ্ট হবে।

—তা হোক দুখানা গাড়ির উপর নজর রাখতে হবে তা ওপথে আরও কত গাড়ি যাতায়াত করতে পারে রাতের বেলায়। তাই যদি কোন পার্ট'স চুরি যায়, তবে?

কথাটা ঠিক।

চপলা ভাবে, সহজই অমলের কথাবার্তা ভাব ভঙ্গির মধ্যে সংযম আর চিন্তায় ভাব ফুটে উঠেছে।

কিন্তু চিরদিন যে এমন ছিল না।

সে সব দিনের কথা চপলা ভুলতে পারেনি—ভুলবে না সে কোনও দিনই।

আজকের এই দামি স্যুট পরা অমল সে দিন তার বাবার অফিসে একটি মজুরীর চাকরী করত। অবশ্য সেসব কথা সে বাবার আর দাদার কাছ থেকে শুনেছিল।

অবশ্য অমল তার সব বিদ্যা গোপন রেখে ছিল সে দিন। এমন কি তার প্রকৃত পরিচয় কেউ জানত না। যেটুকু পরিচয় সে দিয়েছিল, সেই পরিচয়ের মাধ্যমেই সে ছিল পরিচিত।

কিন্তু চপলার কাছে সে কিছু গোপন রাখতে পারেনি।

চপলা জানত, অমল নিজেকে অশিক্ষিত বলে পরিচিত করলে কি হবে সে ইন্টার মিডিয়েট পাশ করে ইঞ্জিনীয়ার ডিগ্রী নিয়েছে।

অবশ্য এই চাকরীতে ঢোকার পিছনে অমলের একটা উদ্দেশ্য

ছিল। সে উদ্দেশ্য কেউ জানত না। এমন কি চপলাকেও সে তা বলে নি।

তাই আজও চপলা বুঝতে পারেনা মিঃ গুপ্তের বা তার বাবার আকস্মিক অন্তর্ধানের সঙ্গে সত্যিই অমলের কোন সংস্রব আছে কিনা।

চপলা আবার ভাল করে তাকায় অমলের দিকে।

যেন চোখের দৃষ্টিপাথরে সে অমলকে বিচার করে নিতে চায়।

কিন্তু কিছুই বুঝতে পারা যায় না। ভাবলেশহীন মুখ অমলের—যেন নিরেট পাথরে তৈরী।

—তা হলে চলি মিস বোস।

— আমি কি দরজা বন্ধ করে শুতে পারি?

—হ্যাঁ। মশারীটা ফেলে দেবেন।

—আচ্ছা।

—রাতে কিছু খাবার প্রয়োজন নেই ত?

—না।

—শোবার সময় ঘরের প্রদীপটা নিভিয়ে দেবেন না—একা নতুন জায়গায় ঘরে আলো থাকা ভাল।

—টর্চটা কি আপনি নিয়ে যাবেন নাকি?

—না নিয়ে গেলে চলবে কি করে। অন্ধকার রাত—গাড়িতে একা থাকব।

—তা বেশ ত। কিন্তু প্রদীপের তেল যদি ফুরিয়ে যায়?

—ভয় নেই, ওখানে দেখুন অনেকটা বাটিতে তেল আছে। আরও একটা প্রদীপ আছে পাশে। দরকার হলে এটাও জ্বেলে রাখতে পারেন।

—আচ্ছা।

অমল ধীর পায়ে বেরিয়ে যায়। কি একটা কথা যেন জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে করে না।

চপলা বুঝতে পারে।

অমল নিশ্চয়ই তার নিজের কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে গেছিল।

কিন্তু পরে নিজের থেকেই অপ্রয়োজনীয় কৌতুহলকে নিবৃত্ত করেছে।

চপলা দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

বৃষ্টির মধ্যেই অমলের এই আকস্মিক চলে যাওয়া তার ঠিক মনঃপূত হচ্ছিল না। তবু সে বাধা দিল না। জানে, অমল নিজে যা ভাল বুঝবে তাই করবে।—কারও কথাই সে শুনবে না।

চপলা তাই দরজা বন্ধ করে আরও একটা প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়।

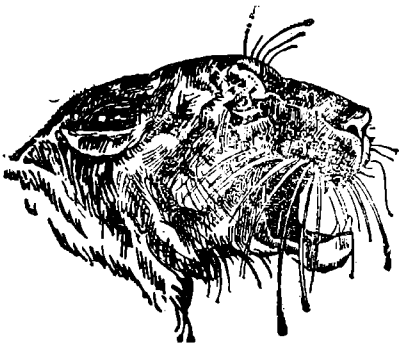

।। তিন ।।

বিছানায় শুয়েও কিন্তু ঘুম আসে না চপলার একের পর এক কতো ঘটনা মনে পড়ে। তার মনে যে একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে, কে মিঃ গুপ্তের হত্যাকারী? মিঃ বোস হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হলেন।

অমল…

না, অমলকে সে কোনও দিনই হীন বা জঘন্য বলে ভাবতে পারেনি।

তার বাবা অমলের উপরে যে অবিচার করেছিলেন সে টুকু পর্যন্ত নির্বিঘ্নে সয়ে সে মাথা নিচু করে চলে গেল, সে কখনও হীন হত্যাকারী বা ষড়যন্ত্রকারী হতে পারে না।

ধীরে ধীরে অনেক কথাই চপলার মনে ভেসে ওঠে।

মনে পড়ে প্রথম সেই দিনের কথা—ডাইনিং টেবিলে বসে তার বাবা মিঃ বোস তার দাদা সুমন্তের কাছে অমলের প্রশ্ন যা করেছিলেন।

ঘটনাটা চপলাও শুনেছিলেন।

মিঃ বোসের ফ্যাক্টারীতে বহু দামি একটি নতুন জার্মান মেসিন বসানো হয়েছিল।

জার্মানী থেকে যে ইঞ্জিনীয়ারটি এসে মেসিনটি চালু করে দিলেন

তিনি ফ্যাক্টরীর সুপার-ভাইজারকে ডেকে খুটি নাটি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি চলে যাবার পর মেসিনটি ভালই চলছিল। দিন পনেরো চলার পর মেসিনটি গেল বন্ধ হয়ে।—

মিঃ বোস চিন্তিত হলেন।

সুপার ভাইজার থেকে সব স্টাফ মেসিনটি চালু করতে পারলেন না।

মিঃ বোস যখন হতাশ হয়ে পড়লেন, তখন ফ্যাক্টরীর একজন নতুন সেবার অমল মিঃ বোসের ঘরের সামনে দাড়িয়ে বললে—মে আই কাম ইন?

—ইয়েস। কি চাও তুমি?

—মেসিনটা আমি দেখতে পারি না?

—তুমি কি বুঝবে ওর?

—আজ্ঞে জার্মান ইনজিনীয়ার যখন বোঝাছিলেন তখন আমি ওখানে ছিলাম কিছুটা শুনেছি।—

—ওয়েল, ইউ ক্যান ট্রাই। কিন্তু জেনে রেখো অত দামি মেসিনের কোনও ক্ষতি হলে তুমিই দায়ী থাক।

—অল রাইট স্যার।

অমল বেরিয়ে গেল সুইং ডোর ঠেলে।

ঘন্টা দুয়েক পর।

অমল এসে তার সামনে নমস্কার করে দাঁড়ালো বললে—মেসিন চালু হয়ে গেছে স্যার।

—ইউ, ইউ হ্যাভ ডান ইট ?

—ইয়েস স্যার।

মিঃ বোস শুধু খুশি হলেন না—তিনি অমলের বিরাট প্রতিভার সাক্ষ পেয়ে তাকে এসিটেন্ট সুপার-ভাইজার পদ দিলেন।

মাইনে বাড়লো পঞ্চাশ থেকে আড়াইশো টাকা।

সুকান্ত সেদিন বাবাকে বলে ছিল।—একটু বেশি সুবিধে দেওয়া হলো না কি ?

মিঃ বোস সেদিন বললেন—তুমি জান না সুকান্ত—হি ইজ জুয়েল। ভাল ভাবে সব মেসিনের কাজ শিখে নিলে ও একদিন আমাদের অফিসের মস্ত বড় অ্যাসেট হয়ে দাঁড়াবে।

মিঃ বোসের কথা মিথ্যে হয়নি।

সত্যি অমল সব মেসিনের কাজ শিখে নিল। এত সুন্দর কাজ শিখলে যে দিন রাত কাজ করেও সে তৃপ্তি পেত না, ছোট খাট পার্টস খুলে নিয়ে যেতো বাড়ীতে। বাড়ীতে সে অবসর মত কাজ করে কত সুন্দর ভাবে মেরামত করে রাখত। কাজের প্রতি সে ছিল গভীর মনোযোগ—অপরিসিম আগ্রহ।

সবই চপলা শুনেছিল—কিন্তু কোনদিন যে তাকে নিজে চোখে দেখেনি।

চপলা গেছিল বাবার সঙ্গে দেখা করতে। টিফিনের সময় গাড়িটা চেয়ে নিয়ে সে তার একজন বান্ধবীর সঙ্গে সিনেমায় যাবে এই জন্যে গেছিল সে।

মেসিন রুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ তার চোখ পড়ল একটি তরুণ যুবকের দিকে।

অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতিক যেন যুবকটি। মুখে তেজ, দৃঢ়তা। আর গৌরব যেন ঠিকরে পড়ছে।

পরনে ময়লা প্যান্ট আর শার্ট। কাজ করতে করতে মুখ না তুলেই বললে—প্রফুল্ল দু নম্বর প্লাসটা দেতো।

পাসেই একটা টুলের উপরে যন্ত্রপাতি সব ছড়ানো ছিল। প্রফুল্ল বলে যার নাম ধরে সে ডাকলো আসে পাশে তাকে কোথাও দেখা গেল না

চপলা তখন একটা যন্ত্র তুলে তার হাতে দিল। লোকটি না দেখে সেটা নিলো তারপর বললে—দু'তোর দু-নম্বর প্লাসটা দিবি তো?

বলেই মুখ তুলে দেখলে চপলাকে। বললে আপনি, আপনি কে? এখানে কেন? দেখছেন কি হাই ভোল্টেজের কারেন্ট এখানে।

চলে যান এখান থেকে।

চপলা কোন কথা না বলে চলে গেল। কিছু পরে কি একটা কাজে গেল মিঃ বোসের ঘরে।

গিয়ে দেখে মিঃ বোসের ঘরে তার পাশে মেয়েটি বসে। মিঃ বোস বললে—এসো অমল, তোমার কাজ হয়ে গেল?

—হ্যাঁ স্যার?

—টিফিনে ছুটি নিলে না।

—আমাদের ছুটি নেই স্যার। মেসিনকে বন্ধ রেখে ছুটি উপভোগ করলে কি আমাদের চলে?

—দ্যাটস নাইস ওন ইয়ং ম্যান। জানিস মা চপলা, আমাদের এই হচ্ছে অমল। যিনি এ্যান এ্যাকটিভ স্মার্ট বয়।

চপলা শুধু ঘাড় নাড়ে কিছু বলে না।

অমল ভাবে। শুধু শুধু কেন কটা চড়া কথা শোনাল মেয়েটিকে ?

যদি মেয়েটি বা মিঃ বোস রাগ করেন। সে মনে মনে একটু লজ্জিত হলো—মুখে কিছু বললে না।

চপলা কিন্তু আপাদমস্তক চেয়ে দেখলে। সঙ্গে সঙ্গে সে যে কি ভাবলে, তা সে বা অমল কেউই বুঝতে পারেন না।

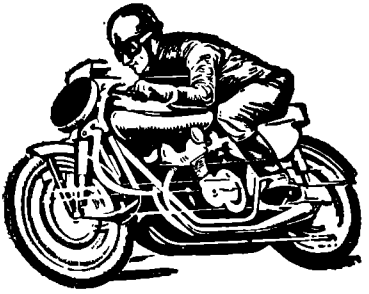

॥ চার ॥

সিনেমা দেখা কিন্তু সেদিন চপলার হলো না। মনটা তার ভালই ছিল।

ঘণ্টাখানেক মিঃ বোসের কাছে বসে থেকে সে বেরিয়ে এলো।

অমলের ঘর দিয়ে যাবার সময়ে সে অমলের দিকে চেয়ে বললে—আচ্ছা আসি।

অমল বললে—একটা কথা মিস বোস।

—বলুন।

—আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার তখনকার রূঢ় ব্যবহারের জন্য।

—না না, ক্ষমা করবার কিছু নেই—দোষ আমি করেছিলাম।

—কেন?

আমি মেসিনের কিছু জানি না। না জেনে এখানে এসে ব্যাঘাত করা আমার উচিত নয়।

—তা ঠিক, কিন্তু আমারও ওরকম ব্যবহার করা উচিত হয়নি।

—কেন? তাতে কি? আচ্ছা একটা কথা—

—বলুন।

—আপনি যদি আমাকে সব কাজ দেখান, তাহলে আমি শিখতে পারি।

—কি হবে এসব শিখে ?

—না মানে তাতে আমি উপকৃত হবো।

—এসব আপনাদের জন্য নয়।

—তার মানে ? যে কোন কাজ শেখা ভাল।

—মানে তা নয়। এসব নিচু কাজ আপনারা কেন শিখবেন বলুন ত ?

—পৃথিবীতে কিছুই ছোট বা নিচু নয়।

—অবশ্য যদি আপনি জোর করে শিখতে চান আমি বাধা দেবো না।

—বেশ। বলুন কবে শেখাবেন ?

—যেদিন আপনি বলবেন ?

—দেখবার সময় স্থির করার ভার গুরুর ওপর। ছাত্রীর উপর নয়।

—বেশ, যে কোনও বন্ধের দিন। আগামী রবিবার।

—কখন ?

—বেলা তিনটে চারটে আসবেন।

—এখানে ?

—হ্যাঁ।

—আপনি রবিবারেও কাজ করেন ?

—আমার কাছে ছুটি বলে কিছু নেই। যেন মেসিন বন্ধ থাকলে

আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। জানেন আমি এই সব মেসিনের হৃদ-স্পন্দন শুনতে পাই—আমার মনে হয় ওদেরও প্রাণ আছে।

—প্রাণ?

—হ্যাঁ—নিশ্চয়ই। তা না হলে বলে কি করে? কাজ করে কি করে।

চপলা বোঝে এটা কি সেন্টিমেন্টের কথা—তবু সে এর প্রতি বাদ করতে পারে না।

* * *

রবিবার দিন ফ্যাক্টরী বন্ধ থাকে—সেদিন কেউ আসে না।

অমল আসে একা—অবশ্য নিয়মিত সে আসে তা নয়। কাজ কর্ম বাকি থাকলে সে করে। বাকী কাজকর্ম করে সে চলে যায় নিজের ঘরে।

সেদিনও সে এসেছিল।

সারা ফ্যাক্টারী বন্ধ—শুধু একা অমল কাজ করে চলছিল। এমন কি অমলের এসিটেন্ট প্রফুল্ল বাবুও রবিবারে আসে না।

বেলা বারোটায় এসে সে কাজ করছিল।

তিনটে নাগাদ সে কাজ শেষ করে বেরুচ্ছে। এমন সময় মচ মচ করে এসে ঢুকলো চপলা।

সেদিন চপলাকে কথা দিলেও কথাটা ভুলে গেছিল অমল। হঠাৎ চপলাকে দেখে মনে পড়ল।

—আপনি এসেছেন?

—হ্যাঁ, কেন কাজ দেখাবেন আমাকে ?

অমল তাকাল চপলার দিকে। এতদিন যে সে চপলাকে দেখেছে তার চেয়ে এ যেন পৃথক। সুন্দরী দামী একটা ডেকরনের শাড়ী পরা। টকটকে লাল ব্লাউজ পরে তার সৌন্দর্যকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছে।

চুল এলানো—একটা দামী রিবন দিয়ে বাধা। মুক্তোর সেটিং গহনা পরেছে সে। দামী সেন্ট মেখেছে—তার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সেন্টের গন্ধে ঘরখানা ভরে উঠল।

—কি দেখছেন ? চপলা প্রশ্ন করলো।

অমল যেন চোখ ফেরাতে পারছিল না।

—কি দেখছেন ?

—নিন আরম্ভ করুন।

—এই দেখুন। এটা যেন স্যাটার, এটা হুইল—

বাধা দিয়ে চপলা বললে—শুধু নাম বললে কি হবে ? কি কাজ হয় কোনটা দিয়ে কিভাবে মেসিন চলে বুঝিয়ে দিন।

অমল বোঝাতে থাকে চপলা শোনে।

একটু পরে বললে—শুনছেন ত ? বুঝলেন কিছু।

—না। কি হবে এ সব বুঝে ? মেসিন বানিয়ে কি লাভ ?

—মেসিনটা হলো ইনডাষ্ট্রি অর্থাৎ শিল্পের প্রতীক।

—ছাই, হাজার হাজার মানুষের, শ্রমিকের বুকের রক্ত নিংড়ে নেবার বস্তু।

কোন উত্তর দিতে পারে না অমল। একজন মিল মালিকের মুখে

একি কথা। সে দ্বিধা করে। চপলা বলে—

এখন কাজ থাক, চলুন একটু বেড়িয়ে আসি।

—কোথায়?

—পথে পথে।

জোর করে অমলকে ডেকে দেন গাড়ীতে উঠিয়ে নেয় চপলা। গাড়ী সোজা যায় ইডেন গার্ডেন তারপর আউটরাম ঘাট।

গঙ্গার ধারে বসে চপলা। অমলও বসে একটু দূরত্ব রেখে।

—আমি প্রায়ই এখানে আসি।

—একা?

—একা ছাড়া দোকা আবার কোথায় পাব?

চপলা হেসে ওঠে। অমল কি বলতে গিয়েও বলতে পারে না।

চপলা বলে—আপনি দিনরাত কি এর আনন্দ পান এইসব কাজের মধ্যে?

—আনন্দ সত্যিই পাই—যদিও কাজ করা আমার কর্তব্য।

—মাঝে মাঝে বেড়াতে বের হতে পারেন ত। জীবন ত আর শুধু কাজকর্মের বাধা ধরা ছক নয়।

—তা ঠিক নয়—কিন্তু গরীবের আর জীবনের এমন দাম কি?

অমলের কথার মধ্যে যেন একটা প্রসন্ন ব্যথার সুর। চপলা চিন্তা করে বলে—জীবনের দাম থাকে না—তৈরী করে নিতে হয়।

—সেই চেষ্টাই ত করছি।

—আচ্ছা, আপনি কি যন্ত্র নিয়ে কাজ করে নিজেও একটা যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছেন।

—একথা কেন বলেছেন ?

—বলছি আপনাকে দেখে। জীবনের বিরাট একটা অংশ যে আপনার এই যন্ত্রের বাইরেও রয়ে গেছে তা কি আপনি জানেন না ?

—কথাটা ঠিক। কিন্তু জীবনের প্রত্যক্ষ পাবার সময় ত পায়নি।

কোন উত্তর দেয় না চপলা।

ধীরে ধীরে চিন্তা করে—সত্যিই এ সে কি করেছে।

কিছুক্ষণ পরে উঠে পড়ে দুজনে। চপলা নিজেই ড্রাইভ করে অমলকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে চলে যায়।

॥ পাঁচ ॥

তারপর কটা দিন কাটে চপলার, যেন একটা আনন্দের মধ্য দিয়ে।

চপলাকে যেন এতদিনে অমলের নেশায় পেয়ে যায়। অমল যে তার মনের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না তা সে কল্পনা-তেও স্থান দেয়নি কোন দিন।

একদিন ছুটির পর অমলকে হঠাৎ এসে ডেকে নিল চপলা। একটা ট্যাক্সি করে তারা দুজনে গেল লেকে।

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিল চপলা। গিয়ে বসল একটা নারকেল কুঞ্জের পাশে।

চপলা বললে—কেমন লাগছে?

—ভাল।

—কি ভাল লাগছে?

—তোমাকে।

—তাহলে এতদিনে স্বীকার করলেন যে আমাকে সত্যিই আপনার ভাল লাগে?

অমল ঘাড় নাড়ে—কোনও দিন অস্বীকার করেছি কি?

—তবে চুপ করে আছেন কেন?

—কি করব তাহলে?

—নিজেকে প্রকাশ করবেন। বাবাকে জানাবেন কথাটা—

—না।

—কেন ?

—তুমি যে মালিকের মেয়ে।

—আপনি কি চিরদিন এখানে চাকরী করেই কাটাবেন ?

—না

—আচ্ছা একটা কথা। আপনি যে অশিক্ষিত লেবার বলে আমাদের কোম্পানীতে চাকরী নিয়েছিলেন, সেটা সত্যি নয় বলে আপনার সঙ্গে একদিন কথাবার্তা বলে বুঝতে পেরেছি। মিথ্যা কথা কেন বাবাকে বলেছেন ?

—এমন বিরাট কিছু শিক্ষিত নই।

—তবু।

—আই এস-সি পাশ করে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনায়ার পাশ করেছিলাম। ইচ্ছা ছিল কিছু অর্থ সঞ্চয় করে বা পাটনারসিপ নিজেই একটা ফার্ম স্টার্ট করব।

—তা করলেন না কেন ?

—বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল—সেটা এখন প্রকাশ্য নয়।

—আচ্ছা তা ত হলো, কিন্তু আমার কথায় ত উত্তর দিলেন না। আমি মালিকের মেয়ে এ কথা কি আপনি ভুলতে পারেন না ?

—ভুলতে চাইলেওশেষ পর্যন্ত পারিনা।

—সত্যিই আমি দুঃখ পাই। তবে একটা কথা ঠিক, আপনি জীবনে বড় হতে চান, আমি তার জন্যে প্রতীক্ষা করব।

—কতদিন ?

—আজীবন।

—তার প্রয়োজন হবে না আমি যখন পড়তাম তখন সেখানকার এক অফিসার আমাকে ভাল বাসতেন। বর্তমানে তিনি নতুন একটি ফার্ম স্টার্ট করেছেন এবং আমাকে ওয়াকিং পার্টনার হিসাবে সেখানে জয়েন করতে বলেছেন।

—সেও ভাল কথা।

—কিন্তু আমি ত চট্ করে এখান থেকে ছেড়ে চলে যেতে পারি না।

তাই—

চপলা হেসে বলে—আচ্ছা সে মন স্থির পরে করবেন। চলুন উঠে গিয়ে একটু ঘুরে আসি।

—চল।

দুজনে উঠে যায়।

* * *

কিন্তু চপলা আজীবন প্রতীক্ষা করবে বলে প্রতীজ্ঞা করলেও মাত্র কয়েটি দিনের বেশী অপেক্ষা করতে পারে না।

কারণ মধ্যে বিলেতের কোর্স শেষ করে সুদীর্ঘ দিন পরে ইংলণ্ড থেকে দেশে ফিরে আসে কমলেশ।

কমলেশ হলো মিঃ বোসের বন্ধু পরোলোকগত—ব্রজেন্দ্রবাবুর একমাত্র সন্তান। আর মিঃ বোসের জীবনে ব্রজেন্দ্রবাবুর সাহায্য ছিল বিরাট।

মিঃ বোস তাঁকে কথাও দিয়েছিলেন ব্রজেন্দ্রবাবুর ছেলে কমলেশের সঙ্গে চপলার বিয়ে দেবেন। সে এক পৃথক ইতিহাস।

ব্রজেন্দ্রবাবু ছিলেন মিঃ বোসের সহপাঠি। কিন্তু ইন্টার মিডিয়েট পাশ করে মিঃ বোস মেক্যানিকাল ইঞ্জিনীয়ারীর—এ ভর্ত্তি হলেন আর ব্রজেন্দ্রবাবু বি—এ, বি—এল পাশ করে হলেন অ্যাডভোকেট।

তারপর মিঃ বোস নিজে নিজে ওরিয়েন্ট ইণ্ডাস্টিজ গড়ে তুলে নিজের ভাগ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, ব্রজেন্দ্রবাবুও একবারে হাইকোর্টে বেশ আসোর জমিয়ে অর্থ উপার্জন করে সেখানেই বাড়ী করলেন

ইতিমধ্যে মিঃ বোস একবার গেলেন এলাহাবাদে ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি মিঃ বোসকে বললেন—তুমি তোমার ফার্মকে আরও বড় করে তোলবার জন্যে যদি আমার কো—অপারেশান চাও তবে আমি রাজি আছি। হাজার পঞ্চাশেকটাকা আমি তোমায় ব্যবসায়ে খাটাতে চাই।

ব্রজেন্দ্রবাবু আগে কমলেশকে দেখে ছিলেন। সে আই—এ ফেল করে বাড়ীতে বসেছিল। তিনি বললেন—তোমার ছেলেটিও বিলিয়েন্ট।

—তা ঠিক, কিন্তু কিছু করছে না—ওর ভবিষ্যত ভেবেই আমি চিন্তাগ্রস্থ।

—কেন?

—ওর পড়াশুনার কোন আগ্রহ নেই।

—তবে ওকে বিলেতে পাঠিয়ে দাওনা—মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হয়ে আসুক। ও অভিজ্ঞ হয়ে ফিরে এলে আমার ফ্যাক্টারীতে ওকে

ইনচার্জ করে নেবো—ভাল পোষ্ট পাবে আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবো। নিজের সম্বন্ধে দেখাশোনা করতে পারবে।

—বেশ ত তবে অশান্তি নেই।

ব্রজেন্দ্রবাবু তারপর হাজার পঞ্চাশেক টাকার বিনিময়ে ওরিয়েন্ট কোম্পানীর এক পঞ্চমাংশের অংশীদার হবে।

কমলেশ বিলেতে গেল।

কিন্তু তার বছর দুয়েক পরে ব্রজেন্দ্রবাবু মারা গেলেন—কমলেশ তখন বিলেতে।

অবশেষে সেই কমলেশ পুরো তিন বছর পরে ফিরে আসছে কোলকাতার বুকে।

কোলকাতায় এসে দামী হোটেলে উঠল সে।

পঞ্চাশ হাজার টাকা ছাড়াও তার বাবা ইনভেষ্টমেন্ট রেখে গেছে দেড় লক্ষ টাকা। সেই টাকায় তার বেশ ভালভাবে কাটতে লাগল।

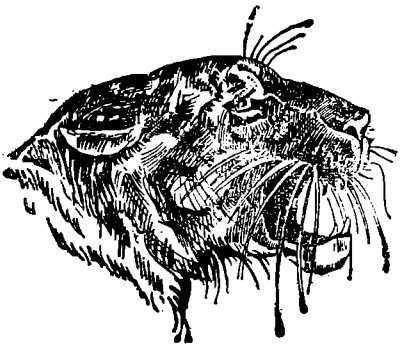

॥ ছয় ॥

কমলেশ আসার পর থেকেই চপলার মন থেকে অমল যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। চপলা অবশ্য জোর করে অমলকে ভুলতে চায়নি—কিন্তু কমলেশ এসে এত আকস্মিক ভাবে তার হৃদয়কে অধিকার করে নিলে যে চপলার কোনও অবকাশ থাকল না অমলের বিষয়ে ভাববার।

কমলেশ এলো যেন ঝড়ের মত।

চপলা কিছু ভাববার আগেই সে যেন তারপ্রাণের উচ্ছ্বসতা দিয়ে চপলাকে জমিয়ে নিয়ে গেল। চপলা তার বাবার কাছে শুনেছিল যে তিনি কমলেশের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন। কিন্তু তার আগে তিনি নিজেদের মধ্যে পরস্পরের জেনে নিবার সুযোগ দিয়েছিলেন।

কমলেশ আসার দিন চারেক পরে।

সেদিন বিকেলে চপলা অমলের সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে সাজগোজ করছিল।

এমন সময় কমলেশ ঢুকল ঘরে। বললে—ও, ইউ লুক সো চারমিং টুডে। বের হবার জন্য তৈরী হয়েছ বটে। ভালই হলো চলো আজ অনেক দূর থেকে ঘুরে আসি।

চপলা কোন কথা বলতে পারল না। বাধ্য হয়ে কমলেশের সঙ্গে

বের হতে হলো তাকে। মনে মনে ভাবলে, আজ হয়তো অমল কাজের থেকে তার কথা ভাববে।—হয়তো তার জন্য প্রতীক্ষা করবে। কিন্তু ব্যর্থ হলো তার প্রতীক্ষা।

কমলেশ নিজের জন্য একটা গাড়ী কিনেছিল কোলকাতায় এসে। এখন পর্যন্ত সে ওরিয়েন্ট ইণ্ডাষ্ট্রিজের কাজে যোগ দেয়নি। মাস দুয়েক সে ছুটি ভোগ করে ছিল। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর ক্লান্তি দূর করবার জন্যে দুটি মাস বিশ্রাম করছিল সে।

কমলেশ গাড়ি চালাল।

তীব্র বেগে গাড়ী ছুটে চলল জি টি রোড় ধরে।

ব্যারাকপুর—নৈহাটি—কাঁচড়াপাড়া—রানাঘাট।

রানাঘাটে একটা হোটেলে ঢুকে প্রচুর খাবার খেলো দুজনে।

তারপর আবার ফিরে এলো কোলকাতায়। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ময়দানের ধারে আলোর সারি ইডেনগার্ডেনে এসে প্যাকোডার পার্কে বসল দুজনে

কমলেশ বললে—কেমন লাগছে?

—কি?

—আজকের ট্রিপ?

—ভাল।

সত্যিই কমলেশ স্মার্ট এবং আলট্রা মর্ডার্ণ স্টাইলে কিছুটা মুগ্ধ করলে চপলাকে। ঠিক মুগ্ধ নয়—আকৃষ্ট করল।

আর ধীরে ধীরে অমলের কথা দূরে সরে যেতে লাগল তার মন থেকে।

এরমধ্যেই একদিন হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যে চপলা আর অমলের সঙ্গে দেখা করতে পারল না।

সেদিন বিকেলে কমলেশ অন্য দিনের মত তাকে নিয়ে বেরিয়েছিল। চৌরঙ্গীতে নানা রকম খাওয়ার জিনিস কিনে কিনে ওরা গেল ইডেন গার্ডেনে।

ইডেন গার্ডেনে একটা গাছের নিচে বসতে যাচ্ছিল দুজনে। এমন সময় দেখতে পেল অমল তাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অমল ইদানীং মাঝে মাঝে এখানে আসত। চপলা কেন তার সঙ্গে মেশেনা সে কথা শুনতে পেয়েছিল অমল। তাই সে আর তাকে আদর করত না।

কিন্তু আজকে হঠাৎ মুখোমুখি এভাবে ধরা পড়ে যাওয়াতে চপলা খুব লজ্জিত হলো। সে মুখ ফিরিয়ে নিলো—কোনও কথা বলে না। যাতে অমলকে সে চেনে না। অমল চুপচাপ চলে গেল।

চপলা কমলেশকে বললে চল—ওঠা যাক।

—কোথায়?

—বাড়ী যাব।

—কেন? ফিরপোতে যাবেনা।

—না।

—সেকি!

—শরীরটা খুব খারাপ লাগছে।

—তাহলে আমার ফ্লাটে চলো। শরীরটা সুস্থ হলে চলে যাবে।

চপলা আপত্তি করতে পারল না।

কমলেশ গাড়ি চালাল তার ফ্লাটের দিকে। একটু পরে কমলেশ এলো হোটেলের ফ্লাটে।

কমলেশের সামনের ঘরে ঢুকেই দেখল একটা মস্ত ফোটো টাঙান। কমলেশের পাশে একটি অবাঙালী মেয়ে। দুজনের গ্রুপ ফোটো।

চপলা বললে—ওটা কার ফটো?

—মিস নাইটের। আমায় বিলেতের একজন বান্ধবী।

—ও।

চপলা কিছু বললে না। চুপ করে শুয়ে বিশ্রাম নিতে লাগল।

একটু পরে বললে—আপনি কবে কাজে যোগ দেবেন?

কমলেশ বললে—তোমার বাবা বলেছেন আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে যোগ দেব। তবে হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন?

চপলা বললে হাসবার ভঙ্গি করে—না মানে আগে বাবার কাছে যেতাম। আজকাল ত তা হয় না। আপনি যোগ দিলে আবার যেতে পারি।

—দ্যাটস গুড।

—কিন্তু ফ্যাক্টরীতে যে রাষ্ট্র হয়ে গেছে আপনার কথা—তাই বড় লজ্জা করবে।

কমলেশ একটু অবাক হয়। বলে—এতে লজ্জার কি আছে? এটা ত প্রি ম্যারেজ ইন গেজমেণ্ট। সব দেশেই হয়ে থাকে।

—তা নয়, তবে—

—আচ্ছা। সে কথা থাক, তাহলে এবার বলো আমাকে কেমন লাগছে?

—কি আর বলবো ?

—তবু বল। ডু ইউ লাইক মি ?

—হ্যাঁ।

—দ্যাটস গুড। আমিও তোমাকে পেলে তোমার জীবন ধন্য মনে করব।

—সেটা বাবার সম্পত্তির অর্ধেক অংশীদার হবার জন্য নয়তো ?

—হোয়াট ডু ইউ সে চপলা।

—না। নিশ্চয়ই শুনেছেন বাবা আর তার ফ্যাক্টরী আপনার আর দাদার মধ্যে ইক্যুয়ালি ভাগ করে দিয়ে উইল করবেন শুনেছি। অবশ্য সেটা আমাদের সম্বন্ধে পাকাপাকি হলে হবে। ফ্যাক্টরীতে যোগ দিতে তাই আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

হেসে কমলেশ বললে—তোমাকে যেমন লাগছে তেমন নিশ্চয়ই লাগবে না।

—কেন ?

—কি আছে এই নিষ্প্রান যন্তগুলো আর দৈনন্দিন কাজের মধ্যে।

তার সঙ্গে তোমার কোম্পানীর তুলনা চলে। চপলার হঠাৎ মনে পড়ে যায় অমলের কথা। যে ফ্যাক্টরীর প্রতিটি যন্ত্রের মধ্যে জীবন দেখতে পেত। তার সঙ্গে কমলেশের কি তফাৎ ?

চপলা বললে—আমি চলি।

—কোথায় ?

—বাড়ীতে।

—বেশ চল—যদি তোমার এখানে ভাল না লাগে—

দুজনে উঠে পড়ে।

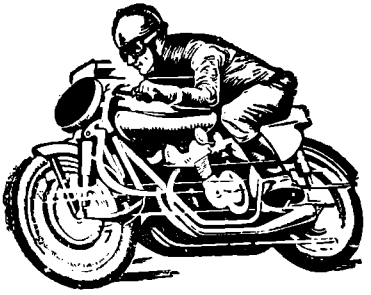

। সাত ।

কমলেশ কাজে যোগ দিল এসিটেন্ট ম্যানেজার হিসাবে। এ পোস্টটি এখানে ছিল না। আগে মিঃ বোসের নীচে ছিলেন বিলাসবাবু বলে একজন লোক। তিনি সকলের কাজ দেখাশুনা করতেন। তার বিজনেস সাইড দেখত চপলার দাদা সুশান্ত। সুশান্তের যন্ত্র বিজ্ঞানে বেশি বিদ্যা। না থাকতে বিলাসবাবু দেখত।

কিন্তু এখন এসিটেন্ট ম্যানেজার হিসাবে মিঃ বোসের দিকেই কমলেশ যোগ দিল—তাই বিলাসবাবুর কোনও প্রয়োজনীয় রইল না ফার্মে।

কমলেশ যোগ দিল দিন পনেরো পরেই। বিলাসবাবুর তাই নোটিশ গেল রেজিগ্নেশানের জন্যে।

কথাটা গেল অমলের কানে।

সে এসে বিলাসবাবু এসে বললে—আপনার জবাব হয়ে গেল শুনেছি?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—মিঃ বোসের হবু জামাই কাজে যোগ দেবার পর আর আমাকে কি দরকার দরকার বলুন।

—কিন্তু বিনা কারণে ডিসচার্জ করল কি করে ?

—দুষ্টের ছলের অভাব হত না। বললে—আমি অকমন্য হয়ে গেছি।

—আশ্চর্য্য ত! এই স্যুট টাই পরা মেসিন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ লোকটি শুধু হবু জামাই বলে কাজ পেলো—আর আপনার মত লোককে চলে যেতে হলো।

—দিনকাল পাল্টে যাচ্ছে অমলবাবু।

অমল কোন কথা বলছে না। তবে এমন এসিটেন্ট ম্যানেজার ব্যবহারে সকলে যে ধীরে ধীরে বিমুখ হয়ে উঠেছিল এটা অমলের নজর এড়ায়নি।

দিন পনেরো পর।

অমল একদিন গম্ভীর মনোযোগ দিয়ে একটা মেসিন পরীক্ষা করছিল।

পেছনে যে কমলেশ এসে দাঁড়িয়ে আছে জানত না। হঠাৎ এক সময় বললে—এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ ?

অমল বললে—এই যন্ত্রটা আজকে মেরামত করতে হবে।—তা না হলে লেবারদের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।

—কিন্তু তোমাকে আমি বার নম্বর দেখতে বলেছিলাম না।

—হাতের কাজ শেষ করে ওটা দেখব। একটা কাজ করতে করতে আরেকটা কাজে মন দেওয়া অসুবিধা। তাছাড়া আরও বেশি আর্জেন্ট।

কমলেশ গর্জন করে ওঠে—সাট্ আপ। তুমি এক্ষুনি আমার অফিসরুমে এসে দেখা করবে।

—কাজ শেষ হয়ে গেলে দেখা করবো। ঘণ্টা খানেক দেরী হবে।

—তাহলে এক ঘণ্টা পরে এসো।

আর কোন কথা না বলে মস্ মস্ করে জুতোর শব্দ তুলে চলে যায়।

অমল কোন কথা না বলে কাজে মন দেয়।

ঘণ্টাখানেক পর। টিফিনের সময়।

অমলের কাজ শেষ করে মেয়েদের ঘরের সামনে গিয়ে বলে—কাম ইন।

—ইয়েস।

অমল ঘরে ঢুকে দেখে আর একটা চেয়ারে বসে আছে চপলা। অমল কোন কথা বললে না। কমলেশ বললে—তুমি আমার কথা না শুনে এভাবে অন্য মেসিনে কাজ করছিল কেন?

—সে কৈফিয়ৎ আপনাকে দিয়ে লাভ নেই। প্রয়োজন হলে মিঃ বোসকে জানাব।

—ইট ইম্পার্টিনেন্ট, আমি এক্ষুনি কৈফিয়ৎ চাই।

—তার আগে আমি রেজিগনেশান সাবমিট করছি। সেটা নিয়েই এসেছি।

বলেই সে রেজিগনেশনটা বের করে দেয় তার দিকে।

কমলেশ এতটা আশা করেনি।

সে কিছুটা বিস্মিত হলে কোন কথা বলতে পারে না।

অমল ধীর পায়ে বেরিয়ে যায়।

অমল চলে গেল। চপলা বলে।—আপনি বাবাকে জিজ্ঞাসা না করে এতটা রূঢ় ব্যবহার করেছেন। এটা কি ভাল হলো।

—তা না করলে ডিসিপ্লিন থাকে না চপলা।

—বাবা শুনলে দুঃখ পাবেন।

—আমি ওকে ম্যানেজ করবো।

চপলা কোন আর কথা বলে না।

* * *

মিঃ বোস সত্যিই খুব ক্ষুব্ধ হলেন কথাটা শুনে। অমল এখান থেকে বিদায় নিয়ে দেখা করল মিঃ সেনের সঙ্গে। তিনি প্রফেসারী ছেড়ে কারখানা খুলেছেন। সে কারখানায় অমলকে নেবার জন্যে প্রপোজও দিয়েছিলেন। অমল তখন রাজী হয়নি—এখন সে রাজী হলো জয়েন করতে।

মিঃ সেন খুবই খুশী হলেন অমলকে পেয়ে। অমল অল্প কিছু দিনের মধ্যে সে কর্ম্মক্ষতার পরিচয় দিলেন। যে সব কোম্পানী আগে ওরিয়েন্ট কোম্পানী থেকে মাল নিতো আর এখন এভারেষ্ট কোম্পানী থেকে মাল নিতে লাগল।

মিঃ সেন খুশী হলেও এখবর গেল মিঃ বোসের কানে।

সেদিন সকাল বেলা।

মিঃ বোস আর সুকান্ত বসেছিল ডাইনিং টেবিলে। মিঃ বোস বললেন সত্যিই কমলেশ বড্ড রাফ। এরকম ট্যাটলেদের অভাব দেখে আমি দুঃখিত হয়েছি। আমি কল্পনাও করতে পারিনি অভাবে অমলকে রিজাইন দিতে হবে।

সুকান্ত বললে—কাজ ও কি রকম করে?

মিঃ বোস বললেন—মিথ্যাই এত দিন বিলেত থেকে এলো। কাজ কিছুই শেখেনি।

—তাই নাকি ?

—আমি ভেবে পাচ্ছি না কি করব। আমাদের অনেক পার্টি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অমল চলে যাওয়ার জন্যে।

—কিন্তু আমরা এখন কি করতে পারি ?

—ওকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে পারি।

চপলা ওদের কথায় বাধা দিল—তাতে ওকে ছোট করা হয় বাবা। অমলবাবু যথেষ্ট রূঢ় ব্যবহার করেছিলেন।

বাধ্য হয়ে দুজনে চুপ করে যান।

* * *

এদিকে কমলেশ ভাবছিল, তার অর্কমন্যতা মিঃ বোসকে দুঃখিত করেছে। তারপর চপলা এসে জানান। তার বাবাও বেশ দুঃখিত কমলেশ তখন একদিন গেল অমলের বাড়ী। ঠিক সন্ধ্যায় গিয়ে সে অমলের সঙ্গে দেখা করলে।

অমল বললে—আপনি ?

—হ্যাঁ, কেন আসাতে নেই নাকি ?

—তা নয়। হঠাৎ আশা করিনি।

—যাক, যে কথা বলতে এসেছিলাম আশাকরি ভুল বুঝবেন না আমাকে। কমলেশ প্রথম অমলকে তুমি বললেন।

—বলুন।

—আপনি আমাদের কাজে জয়েন করুন। আমরা ইনক্রিমেণ্ট দিতে রাজী আছি।

—তা হয় না।

—কেন ?

—আমি ওয়ার্কিং কমিটি হিসাবে কোম্পানিতে পাটনারের কাজ পেয়েছি।

—কত পার্সেন্স পাটনার।

—ওয়ান থার্ড।

—হঠাৎ এত বড় চান্স দিল আপনাকে ?

—হ্যাঁ, তিনি আমাদের প্রফেসায় ছিলেন আমাকে স্নেহ করতেন।

—আপনি কি ডিপ্লোমাধারী।

—হ্যাঁ, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার।

—কোম্পানীতে সে কথা বলোনি কেন ?

—প্রয়োজন মনে করিনি।

—যাক, আপনি যদি আমাদের এখানে জয়েন করেন চারশো টাকা পেতে পারেন।

—তা হয় না।

—পাঁচশো—

—কোন অংকেতেই ফিরতে রাজী নই।

—ছশো, সাতশো—

—মাপ করবেন।

—ও, আপনি তাহলে দৃঢ় সংকল্প ?

—হ্যাঁ, প্রথমটা আমায় প্রাচীন অধ্যাপকের স্নেহ, আর দ্বিতীয়তঃ আমার চান্স আনলিমিটেট। কোম্পানী দাঁড়ালে আমি কয়েক লক্ষ্য টাকাও আয় করতে পারি।

—আই সী।

—কোন কথা না বলে কমলেশ বেড়িয়ে আসে। মনে মনে ভাবে, জীবনে তার বিরাট পরাজয় ঘটল।

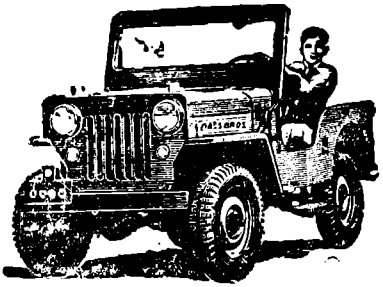

। আট ।

কিন্তু এদিকে কমলেশের জীবন কাঁটাও হঠাৎ নতুন একটা আবর্তে মোড় ফিরল।

কমলেশের মন খারাপ ছিল—তাই সে দু-তিন দিন কাজে আসে নি।

মিঃ বোস এদিকে ঘন ঘন তাগাদা দিলেন চপলাকে বিয়ে করবার জন্যে—কমলেশ ঘন ঘন পিছিয়ে যাচ্ছিলেন।

মিঃ বোস বেশি চাপ দিলে কমলেশ বলে—মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হবো।

—সে কি? এর জন্যে আবার প্রস্তুতির কি আছে?

—নিশ্চয়ই আছে। আমি ঠিক সময় মতই আপনাকে বলব।

মিঃ বোস কথাটা চপলাকে বলেছিলেন।

চপলা শুনে বলেছিল—তুমি বা আমাকে এত তাড়াতাড়ি তাড়িয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ কেন বাবা।

—তার মানে?

—আমি কি তোমার কাছে এতই বোঝা।

হেসে মিঃ বোস বললেন—তা নয় মা। এটা আমার একটা মস্ত বড় কর্তব্য। মেয়েকে সৎ পাত্রের হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না মা।—সে নিশ্চয়ই একদিন হবে।

—তাত হবেই। নিয়তির উপরে নির্ভর করতে পারলে আর কি আছে। কিন্তু তা আর পারি কৈ?

—তার জন্যে চিন্তা করো না বাবা।

মিঃ বোস কিছু বলেন না।

কিন্তু তার মধ্যে দু—তিন দিন কমলেশ ফ্যাক্টরীতে না আসার জন্যে তিনি চিন্তিত হলেন।

চপলাকে বললেন—তুই একদিন যাত মা।

—কোথায়?

—কমলেশের ফ্লাটে। যে দু-তিন দিন আসেনি।

—আচ্ছা, আমি দেখব। হয়তো অসুখ বিসুখ কিছু হয়েছে।

কিন্তু কমলেশের ফ্ল্যাটে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা যে লাভ করলে তা সত্যিই আকস্মিক এবং অভিনব।

কদিন ধরে কমলেশের মনটা খারাপ ছিল। তাই সে দিন রাতে সে ড্রিংক করেছিল। অনেক দিন ধরেই যে অভ্যাসটি ছিল মিঃ বোস চপলা জানত না।

সে দিন রাতে সে মদ খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। টেবিলের উপরে একটা গ্লাসে অনেকটা হুইস্কি ঢালা ছিল।

চপলা যে হঠাৎ ঘরে ঢুকে পরবে তা কল্পনা করতে পারে নি।

চপলা এসে দেখে ফ্ল্যাটের দরজা খোলা—কমলেশ ঘুমোচ্ছে।

হোটেলের বয় বেয়ারা চপলাকে চিনত—তারা কেউ কোন কথা বলতে পারে নি।

চপলা এসে দেখে টেবিলের উপরে একটা নীল রঙের খাম পড়ে আছে।

চপলা দেখল খামের মুখ খোলা—কমলেশ চিঠিটা নিশ্চয়ই পড়েছে।

চপলা কৌতুহলী হয়ে খামটা তুলে নিল। তাতে যে লেখা আছে পড়ে তার মাথা ঘুয়ে গেল।

তাতে লেখা আছে ইংরাজীতে—

প্রিয়তম কমল,

তুমি চলে যাবার পরই চিঠিপত্র দেবে—প্যাসেজ মানি পাঠাব বলে লিখেছিল। কিন্তু কিছুই করলে না। ছেলে মেয়ে দুজনে ড্যাডি ড্যাডি বলে পাগল। আমি কিছুতেই তাদের ভুলিযে রাখতে পারছিনা। আশা করি পত্রপাঠ উত্তর দেবে—

ইতি—

তোমারই, নাইট

চিঠিখানা পড়ে তার মাথা ঘুরতে লাগল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। ভাল করে চেয়ে দেখে টেবিলের উপর থেকে গ্ল্যাটা তুলে নিয়ে নাকের সামনে গন্ধটা শোঁকে একবার। তারপর সেটাও নামিয়ে রেখে ভ্রূ কুঁচকে ও তাকায় কমেশের দিকে।

কমলেশের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

চপলাকে দেখে বলে—তুমি। তুমি এখানে কেন?

—এসে কোন অসুবিধায় সৃষ্টি হয়েছি নিশ্চয়ই।

—না' মানে—

—থাক—তোমার বিলিতী স্ত্রী পুত্র কন্যার কথা জানাজানি হয়ে যাওয়ার জন্যে লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই।

—সে কি তুমি নাইটের চিঠিটা—

—হ্যাঁ, এরপর নিশ্চয়ই কোন কৈফিয়ৎ দেবে না—জেনে গোপন করতে চাইবে না।

—না, মানে সেটা তুমি ভুল বুঝবে না। নিশ্চয়ই এটা বোঝেন চপলা, প্রত্যেক মানুষেরই একটা বায়োলোজিক্যাল নেসেসিটি—সেটা কিছু নয়। ইউ উইল বি মাই অব লিলিগ্যান ওয়াইব।

—সেটা আপ। তোমার মুখে আর একথা মানায় না।

—বোস চপলা।

—না।

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল চপলা।

* * *

পরদিন অফিসে যোগ দেন কমলেশ। নিজের টেবিলে আধঘণ্টা বসবার পরেই একজন বেয়ারা এসে বললে—মিঃ বোস আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—এক্ষুণি?

—হ্যাঁ।

দুরু দুরু বুকে দাঁড়িয়ে থাকে কমলেশ। ভাবে এক্ষুণি গিয়ে হয়ত কি একটা পরিস্থিতির সামনে পড়বে।

তবু না গিয়ে উপায় নেই। কমলেশ উঠে মিঃ বোসের সঙ্গে দেখা করেন।

মিঃ বোস বলেন—কি খবর কদিন আসনি কেন?

—শরীরটা একটু খারাপ ছিল।

—এখন ভাল ত?

—মোটামুটি ভাল।

—শরীরের বিষয়ে ভাল করে যত্ন নেবে। আচ্ছা কাজে যাও।

কমলেশের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সে বেরিয়ে যাবার জন্য তৈরী হলো।

সে ভেবেছিল কোনও ভাবে একবার চপলার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে বাবার সব সম্পত্তি সে পাবে।

চপলা তখন তাকে ছাড়তে পারবে না—তখন নাইটের প্যামেজ সাথী পাঠিয়ে তাকেও নিয়ে আসবে।

কিন্তু তখন নাইটের ব্যাপারটা জেনে বিশ্রী একটা পরিবেশের সামনে পড়তে হলো তাকে।

হঠাৎ মিঃ বোস তাকে ডাকলেন—শোন। ফিরে দাঁড়াল কমলেশ।

—বলুন।

—তুমি কি স্থির করলে?

—হ্যাঁ। আগামী অঘ্রাণ।

—ঠিক আছে।

কমলেশ বেরিয়ে গেল।

মিঃ বোসও কমলেশের মানসিক পরিবর্তনে খুশী হলো। যাক এখনো ছমাস দেরী। কোন ভয় নেই তার।

চপলা তার মিঃ বোসকে কিছু বলেনি, এজন্যে আনন্দিত হলো না।

* * *

চপলা কিন্তু নিশ্চিত ছিলনা।

সে বেশ ভাল ভাবেই বুঝেছিল, কমলেশকে বিয়ে করতে যে পারে না।

কিন্তু সে কি করবে?

এই চিন্তায় শরীরের মধ্যে দিয়ে খুশীর বড় যায় তার মাথায় ভেতর দিয়ে অবশেষে মন স্থির করে।

হ্যাঁ অমল—অমলই তার শেষ অবলম্বন। ছি, ছি, কি ভুলই না সে করতে বলেছিল, সাময়িক খেয়ালের বসে।

কিন্তু এতদিনে সে ঠিক চিনতে পেরেছে। নিজের সাময়িক মোহের জন্য তার অনুশোচনা হলো।

সেদিন বিকেল।

চপলা গাড়ী নিয়ে হাজীর হলো অমলের বাড়ী। অমল তখন ছোট ছোট যন্ত্র নিয়ে নাড়াচড়া করছে চপলার পায়ের শব্দে মুখ তুলল।

—তুমি?

—হ্যাঁ।

—হঠাৎ ও সময়ে?

—কোন আশা করনি না কি ?

—না, ও সময়ে ও বেয়ারে স্বপ্ন মনে হচ্ছে। হঠাৎ চপলা অমলের হাত ধরে কেঁদে ফেলল।

—একি তুমি কাঁদছ ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—তুমি যাবার আমাকে।

—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

—বাবার কথা মত বলে জীবনে ভুল করেছি তা এখন বুঝতে পেরেছি। তাই এলাম তোমার কাছে।

—অনুশোচনা ?

—যদি বলো তবে তাই।

—কিন্তু কারণ ত খুজে পেলাম না।

—সব বলছি আগে বলো সব শুনলে তুমি ক্ষমা করবে।

—আচ্ছা।

—আমায় বিশ্বাস করো তুমি।

—না।

—কিন্তু সব শুনলেই নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে।

—বলো শুনি।

চপলা ধীরে ধীরে সব খুলে বললে। বলে কি ভাবে কমলেশ তার সঙ্গে, তার বাবার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।

অমল বললে—আমি এমনি একটা কিছু আশা করেছিলাম।

—কি করে জানলে ?

—মানুষকে দেখে মোটামুটি বলা যায়।

—তাহলে এখন উপায় ?

—উপায় একটিই আছে।

—কি সে উপায় বলো। তোমার উপরে আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করছি অমল।

—শুনবে ? প্রতিবাদ করবে না ত ?

—না।

—তবে শোন বলি। আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে তোমাকে বিয়ে করবার প্রপোজ্যাল দেব।

—কিন্তু বাবা যদি রাগ করেন ?

—সে দায়িত্ব আমার।

—বেশ তুমি যা বোঝ তাই কর।

চপলা বাধা দেয় না।

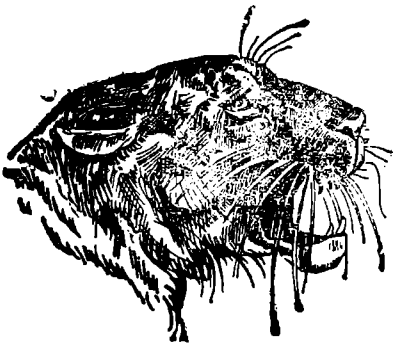

॥ নয় ॥

দু'দিন পর। সকাল বেলা।

চপলা সে বাড়ীতেই ছিল। মিঃ বোস জল খাবার খেয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন ড্রইংরুমে বসে।

এমন সময় অমল আসেন ঘরে।

অমলকে দেখে মিঃ বোস বললেন—এই যে, অমল এসো।

—গুড্ মরনিং স্যার।

—তুমি যাওয়াতে দিয়ে চলে আমি দুঃখিত হয়েছিলাম। আসা করি মনস্থির করেছো?

—হ্যাঁ।

—কবে জয়েন করেছো?

—আমি ত জয়েন করেছি স্যার এভারেষ্টে। এখন ওয়াটিং পার্টনার।

—তাহলে তুমি এখানে আসবেন।

—যদি কোন দিন কাজ না করি তবে এখানেই আসব।

—তুমি হঠাৎ যে ভাবে চলে গেলে, আমার সাথে একবার কনসাল্টও করলে না।

—এ অবস্থায় রেজিগনেশান না দিলে সম্মান নিয়ে টানাটানি হতো।

—শুনলাম, তুমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার পাশ করেছ। আমাদের কাছে সেটা গোপন করে সামান্য লেবার হিসাবে কাজ নিয়েছিলে কেন?

—সেটা এখন প্রকাশ করতে চাই না।

অমল কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারলে না। এই ওরিয়েন্ট কোম্পানীর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অমলের বাবা।

মিঃ বোস ছিলেন তার কর্মচারী? ধীরে ধীরে অমলের বাবার মৃত্যুর পরে নাবালক পাঁচ বছরের ছেলে তার সঙ্গে ফাঁকি দিয়ে মিঃ সারা কোম্পানীটি হাত করেছিলেন সে এক বিচিত্র ইতিহাস। অমলের মা বোন কলকাতা ছেড়ে দেশের বাড়ীতে যায়। সেখানেই অমল কোন রকমে মানুষ হয়। অমল সব সময় ছিল মায়ের কাছে। অমলের মা দেশের জমি বাড়ী বিক্রি করে অমলকে মানুষ করেন। তারই মৃত্যু-শয্যায় অমল প্রতিজ্ঞা করেছিল মাকে যে এইভাবে পথের ভিখারী করেছিল, তাকে উচিত শাস্তি দেবে। তাই ওরিয়েন্ট ইঞ্জিনীয়ার ফার্ম ধ্বংস করার ইচ্ছা নিয়েই অমল এখানে কাজ সুরু করেছিল।

কিন্তু তা সে পারেননি।

দিনের পর দিন ইচ্ছা করেছে এইসব মেসিনগুলো ভেঙেচুরে গুড়িয়ে ফেলে কিন্তু সে তা পারেনি। সে শিল্পী সে স্রষ্টা, সে এই যন্ত্রগুলোর গায়ে আঘাত হানতে পারেননি।

অমল কিন্তু কিছুই বললে না।

মনের সব কথা সে চেপে শুধু বললে—আজ কণ্ঠে এসব কথা বলতে আসেনি স্যার।

—তবে কেন এসেছ ?

—আমার একটা প্রাইভেট কথা ছিল।

—তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পার।

—যদি কিছু মনে না করেন।

—চপলাকে আমি বিয়ে করতে চাই।

—তুমি···ইউ···

—হ্যাঁ স্যার।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ বোস উঠে দাঁড়াল। উন্মত্তের মত উঠানে দাঁড়ান।

—স্কাউনড্রেল, তোমার স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। গেট আউট গেট আউট ইমিডিয়েটলি।

বলেই তিনি অমলের গালে একটি চড় মারেন।

চপলা ছুটে আসে পাশের ঘর থেকে। সেও কথাবার্তাগুলো আড়াল থেকে শুনেছিল।

অমল মাথা নিচু হয়ে বেরিয়ে গেল।

একটা কথা উচ্চারণ করে না।

—বাবা, বাবা! চপলা দৌড়ে আসে

—না।

—বাবা ওকে যেতে দিও না।

বলেই চপলা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। অমল তখন অনেক দূরে।

মিঃ বোস কিছুই বুঝতে পারে না।

ধীরে ধীরে তিনি চপলার জ্ঞানসঞ্চারের চেষ্টা করেন।

ঝি চাকরেরা ছুটে আসে। স্মেলিং সল্ট জল দিতে ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসে চপলার।

—বাবা।

চপলা মুখ তোলে।

তুমি চুপ হয়ে থাক মা।

চপলা কোন কথা বলে না।

এমন সময় ঘরে প্রবেশ করে বিনয় গুপ্ত, সেই রিটায়ার্ড কর্মচারী —তার সঙ্গে কমলেশ।

বিনয় গুপ্ত বলে—আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল স্যার।

—বলুন।

—আমি কাজ ছেড়ে দিলে জানাশোনা কর্মচারী, ওর কাজের উপর নজর রাখত। আজ আমি একে ধরে এনেছি আপনার কাছে। ইনি এই কদিনই প্রায় সাত আট হাজার টাকা গোলমাল করে ক্যাশ সর্ট করেছে।

—আপনি ঠিক জানেন।

—হ্যা স্যার।

—কমলেশ, ইনি যা বলছেন তা সত্যি?

কমলেশ বলে—না না, টাকাটা এখনও খাতায় এনট্রি করিনি। পরে এনট্রি করেছিলাম। ইনি আমার ঘরে এসে বিনা কারণে খাতা সার্চ করেন।

মিঃ বোস কোন কথা বলে না। গম্ভীরভাবে শুধু বলেন— হুঁ।

তারপর একটু থেমে বলেন—মিঃ গুপ্ত, আমি ব্যাপারটা এনকোয়ারী করব। আপনি পরে দেখা করবেন।

—আচ্ছা স্যার।

মিঃ গুপ্ত বেরিয়ে যান।

মিঃ বোস এবারে কমলেশের দিকে চেয়ে বলেন তুমি মনোস্থির করেছ? এবাউট ম্যারেজ—

কমলেশ কিছু বলার আগে—চপলা বলে দোজ বরের সাথে আমার বিয়ে দিতে চাও?

—ওকথা কেন?

—ওকেই জিজ্ঞাসা করো। বিলাতে ওর স্ত্রী এখনও বেঁচে আছে।

—ইজ ইট কমলেশ?

—না মানে, তা ঠিক নয় স্যার। মানে আমার লিগ্যাল এয়ার, ছাড়া হতে পারে না।

—সাট আপ রাস্কেল গেট আউট।

কমলেশ কোন কথা বলে না মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসে।

মিঃ বোস বলেন—উঃ কি নীচ, কি শয়তান।

চপলা বলে, কিন্তু তুমি অমলকে কেন এভাবে—

মিঃ বোস কোনও কথা বলে না।

—আমি তাকে বলেছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

—বাট আই কুড নট আণ্ডার স্ট্যাণ্ড। আমি অমলকে না চিনে কমলেশকে নিয়ে মেতে ছিলাম। আর আশা করি এবারে ভুল করব না।

মিঃ বোস উঠে দাঁড়ায়।

॥ দশ ॥

সেদিনই বিকেলে মিঃ বোস নিজে গাড়ীতে করে অমলের বাড়ীতে যান। সঙ্গে চপলাও ছিল।

কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন অমল বাড়ী নেই। একটা চাকর ছিল। মিঃ বোস প্রশ্ন করলেন— অমলবাবু আছেন?

—না।

—কোথায় গেছেন?

—কোলকাতার বাইরে গেছেন।

—কবে ফিরবেন?

—কিছু বলে যাননি। তবে দেরী হবে।

মিঃ বোস আর চপলা ফিরে আসে। অমলের সন্ধানই পাওয়া যায় না।

তারপর দিন দশেক কেটে যায়।

অমলের কোনও খবর পেলেন না। এদিকে কমলেশ দীর্ঘদিন আর কারখানায় আসে না। একটা কৈফিয়েতনেশান লেটার পাঠিয়ে দেয় শুধু।

খবর নিয়ে জানা গেল, ক্যাশে প্রায় দশ হাজার টাকা সর্ট।

কমলেশ লিখে পাঠায়।

প্রিয় মিঃ বোস,

যে টাকাটা সর্ট আছে, সেটা আমার বাবা যে টাকা ইনভেষ্ট করেছিলেন সেই পঞ্চাশ হাজার থেকে কেটে নেবেন। আর আমার অংশে বাবার ফাইনান্স করা টাকার অংশে যে মূলধন জমা হয়েছে সব সমেত সম্পূর্ণ টাকা মাস দুয়েকের মধ্যে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

ইতি—

কমলেশ

চিঠিটা মিঃ বোস পড়লেন, বলেন স্টুপিড। চপলাও চিঠিটাও পড়ে।

ব্যাস— ঠিক আছে বাবা টাকাটা দিয়ে তুমি সম্পর্ক চুকিয়ে দাও।

মিঃ বোস বললেন—তাত দেবই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না ব্রজেন্দ্রর ছেলে কি করে এত নীচ হতে পারে।

—ও নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই বাবা।

—তাত জানি। আমার সব সাধ আশা যেন নিমেষে চুরমার হয়ে গেল মা।

চপলা কোনও উত্তর দেয় না।

* * *

কিন্তু এর কয়েকদিন পরই মিঃ গুপ্তকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করেন গাড়ীর মধ্যে।

মিঃ বোস ও চপলা দেখছিল। চপলা মিঃ গুপ্তের দেহ দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

মিঃ বোস তাকে সান্ত্বনা দেয়।

পুলিশ এব্যাপারে অনেককে সন্দেহ করে। এমন কি অমলকেও বাদ দেয় না।

অমলের অফিসে পুলিশ যায় এনকোয়ারী করতে।

সেখানে গিয়ে শোনে, অমল প্রায় ছমাস ছুটি নিয়ে বাইরে গেছে। তার শরীর অসুস্থ। ছ-মাসের মধ্যে কাজে জয়েন করতে পারবে না।

পুলিশ কোন সিদ্ধান্ততেই পৌছাতে পারেনি। তখন তারা গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর উপর এ ব্যাপারে তদন্তভার অর্পণ করেন।

দীপক তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেন। কোনও এমন পয়েন্ট পায় না, যা থেকে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা যায়। তবে আশা ছেড়ে দেয় না।

ঘটনাটা মিঃ বোসকেও বিচলিত করে।

মিঃ গুপ্ত রাত দশটার সময় বাড়ী ফিরছিলেন গাড়ীতে করে। হঠাৎ তাকে হত্যা করে তার দেহ সমেত গাড়ীটি ময়দানের সামনে রেখে দিল। পুলিশ বললে, নিশ্চয়ই হত্যাকারী মিঃ গুপ্তের চেনা লোক রাস্তার মাঝে গাড়ী দাঁড় করিয়ে গাড়ীতে উঠে আকস্মিক ভাবে তাঁকে হত্যা করে গাড়ীটা চালিয়ে ময়দানের মধ্যে রেখে গেছে।

* * *

ঘটনার দ্রুতগতি এবার অন্যদিকে মোড় নেয়।

মিঃ বোস এর দিন পনের বাদে ফ্লাটে যান—সেখান থেকে আর বাড়ী ফেরেন না। চপলা সারারাত অপেক্ষা করে পুলিশকে ভোরবেলা জানায়।

মিঃ বোস এর দিন পনের বাদে ফ্লাটে যান সেখান থেকে আর বাড়ী ফেরেন না। চপলা সারারাত অপেক্ষা করে পুলিশকে ভোরবেলা জানায়।

যথারীতি পুলিশ এসে ব্যাপারটা তদন্ত করে যান—কিন্তু কোথায় অদৃশ্য হলেন তা তাঁর খুঁজে বের করতে পারেন না।

চপলা যেন পাগলের মত হয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করে সে। মিঃ বোসের কোনও খবর মেলেনা। তিনি যেন বাতাসে মিশে গেছেন।

পরদিন সংবাদ পত্রে বের হয়—

বিখ্যাত মিনি ও নেয়ার শিল্পপতি মিঃ বোস অদৃশ্য।

কদিন আগে ফ্যাক্টারীর ম্যানেজার মিঃ গুপ্তের রহস্যজনক মৃত্যু। পুলিশের ব্যর্থতা।

পুলিশ প্রধানতঃ দুজনকে সন্দেহ করেন।

অমল আর কমলেশ।

কিন্তু অমল নিরুদ্দিষ্ট। কমলেশকে সন্দেহ করবার মত কোনও কারণ পুলিশ খুঁজে পায় না।

এমনি ভাবে কেটে যায়।

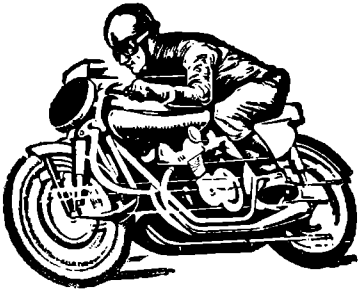

। এগার ।

পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে।

শোনা যায় পাখীদের সুন্দর ডাক। ধীরে ধীরে চপলার ঘুম ভেঙে যায়। দেখে ভোর হয়ে আসছে।

চপলা সারারাত জেগে ভোরবেলা ঘুমিয়ে যায়।

বিগত ঘটনাগুলি সারা রাত তাকে জাগিয়া দেহের ক্লান্তি বাড়িয়ে আনে।

চপলা উঠে বসে দরজা খোলে।

বৃদ্ধ হিন্দুস্থানিটি এগিয়ে আসে বলে—আপনার ঘুম ভেঙে গেল মেমসাব?

—হ্যাঁ, সাহেব কোথায়?

—তিনি গাড়ী মেরামত করছেন।

—এখান থেকে থানা কত দূর?

—পাঁচ-ছ মাইল দূরে—এই রাস্তা ধরেই।

ঠিক আছে।

চপলা বেড়িয়ে যায়। তার গাড়ী যেখানে রাখা ছিল সেখানে যায়।

দেখে তার গাড়ী খানা মেরামত করতে ব্যাপৃত। গাড়ী মেরামতের মোটামুটি মন্ত্রপাতি অমলের গাড়ীতে ছিল।

অমল এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর পার্টনার হিসাবে ভাল টাকাই উপার্জন করতো।

—সুপ্রভাত চপলা দেবী। অমল বলে।

—সুপ্রভাত।

—আপনার গাড়ী মেরামত করছি।

—আচ্ছা আমি আপনার গাড়ীটা নিয়ে একটু ঘুরে আসিতে পারি?

—কোথায় যাবেন?

—এই কাছেই যাব?

—আসুন

চপলা বেরিয়ে যায়—থানায় গিয়ে সে সোজা অমলের উপর তার বাবার মিঃ গুপ্তের মৃত্যুর কথা বলে। ওসি মিঃ ভগত কনেষ্টেবল নিয়ে চপলার সঙ্গে ওই গাড়ীতে চলে আসে।

হঠাৎ পুলিশ দেখে অমল অবাক হয়।

কি ব্যাপার চপলা দেবী?

মঃ ভগত এগিয়ে এসে বলেন ইউ আর আণ্ডার এ্যারেষ্ট অমল বাবু।

—কেন?

—কোলকাতা পুলিশদের সন্দেহ ক্রমে আপনাকে এ্যারেষ্ট করা হচ্ছে। আপনাকে চালান দেওয়া হবে কোকাতায়।

—আমাকে?

—হ্যাঁ, পুলিশ আপনাকে সন্দেহ করে?

—এটা নিয়ে চলুন—থানায় জমা থাকবে।

—আচ্ছা।

বলে অমল তাকায় চপলার দিকে। বলে—আপনার গাড়ী ঠিক হয়ে গেছে।

চপলা বলে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি হাজারীবাগ যাব না। আমি যাব কোলকাতার দিকে।

চপলা গাড়ীতে উঠে।

* * *

প্রখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী সে দিন ভারল্যাবটারীতে বসে কতকগুলো কেমিক্যালস নিয়ে রিসার্চ করছিল।

এমন সময় সে তার সহকারী রতনকে ডেকে বললে—একটা কাজ কর রতন ভাই?

—কি কাজ?

—গোলাপ গাছে সার দেবার জন্য আমি কিছুটা বোলডাষ্ট ওঘরে রেখেছি। তুই খানিকটা নিয়ে আয় এই কেমিক্যাল টেষ্ট করব।

—আচ্ছা

রতন বেরিয়ে যায়।

একটু পরে ফিরে আসে বোলডাষ্ট নিয়ে। দীপক একটা টেষ্ট টিউবের তরল পদার্থের মধ্যে খানিকটা ঢেলে দেয়। তারপর সেটা ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে।

তারপর একটা মাইস্টোপের মধ্যে কিছুটা। পদার্থ একটা স্লাইডে রেখে মোনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে।

হঠাৎ দীপক বলে উঠে—তুই কি এনেছিস রতন?

—এই প্যাকেটে লেখা ছিল?

—কিন্তু তবে হিউম্যান বোন স্যায়ে দেখছি। কি ব্যাপার বলতো?

—তার মানে?

—মানে জীব জন্তুর হাড়ের গুড়ো ও তো পাবে। কিন্তু মানুষের এগুলো কি করে এলো।

—আশ্চর্য ত।

—হ্যাঁ, এই তো বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সত্যিই আমি বেশ ফিউ-রীয়াস হয়ে উঠছি। চলতো আমার সঙ্গে?

—কোথায়?

—মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে।

—চল।

দুজনে গাড়ীতে বেরিয়ে পড়ে। অবশেষে নির্দিষ্ট মার্কেটের দোকানে এসে বলে—আপনার কোল্ডষ্টি কোথা থেকে কেনলেন?

—চেতলায় একটা কোম্পানী আছে।

—ঠিকানা?

—ছাব্বিশের দশ চেতলা রোড।

—আচ্ছা, ঠিক আছে।

দীপক সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। গাড়ীতে উঠে বসে।

গাড়ী ছুটে চলে চেতলার দিকে।

চেতলার নির্দিষ্ট কোম্পানীতে এসে দীপক মালিকের সঙ্গে দেখা করে। মালিক একজন মুসলমান।

দীপক নিজের কার্ডটা দেখায়—কয়েকটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

—বলুন।

—জীব-জন্তুর হাড় কোথায় কেনেন?

—কয়েক জন লোক এসে ওজন দরে হাড় দিয়ে যায় সাত দশ বছর ধরে তারা দিচ্ছে। আমরা সেই হাড় বিক্রি করি।

—আচ্ছা, সম্প্রতি কোন নতুন লোক এসে আপনার কাছে হাড় বিক্রি করে দিয়ে গেছে।

—নতুন লোক ?

—হ্যাঁ।

—ও, হ্যাঁ মনে পড়েছে, দিন দশেক আগে একটা লোক ম্যুটে করে এসে আমার এখানে মন পাঁচেক হাড় দিয়ে গেছে।

—লোকটার চেহারা আপনার মনে আছে ?

—হ্যাঁ।

—ফটো দেখালে চিনতে পারবেন ?

—নিশ্চয়ই।

আচ্ছা ঠিক আছে।

দীপক বেরিয়ে পড়ে।

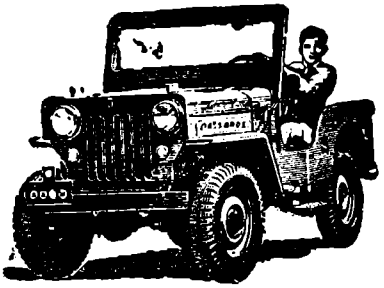

॥ বারো ॥

দীপক গাড়ীতে উঠে বসে, বলে—কি ব্যাপার বলতো দীপক ?

দীপক হেসে বলে—আশ্চর্য নতুন ব্যাপার।

—কি রকম ?

—ছাখ, কলকাতা সহরে দুজন লোক নিখোঁজ হয়েছিল। অমলবাবু আর মিঃ বোস। অমলবাবুর সন্ধান পাওয়া গেছে। আর মিঃ বোস নিখোঁজ। আমার মনে হয় মিঃ বোসকে হত্যা করা হয়েছে। পাপ গোপন করবার জন্যে হাড় গুলো মানুষের হাড়ের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রি করা হয়েছে।

—কে একাজ করেছে ?

—সেটাই তো বের করতে চাই। আমাদের সন্দেহ দুজনের উপর।

কমলেশ আর অমল। এখন দুজনের ফটোই পুলিশের কাছে। আমি সেটা আইডেন্টি করতে চাই।

—ওই লোকটিকে দিয়ে ?

—নিশ্চয়ই।

—যদি ওরা কেউ না হয়।

—তা হলে অন্য কোন লোক হবে।

—এটা করছি অবশ্য অনেকের উপর নির্ভর করে।

—তা ঠিক। তবে দেখা যাক—অনেকের আশ্চর্য বাস্তবে ঘটে।

—আমিও তাই বলব।

দীপক দ্রুত গাড়ী চালায় থানার দিকে। অমলকে কোলকাতা পুলিশ কোর্টে হাজীর করা হলো।

ম্যাজিস্টেট সব শুনে বললেন—তাহলে শুধুমাত্র সন্দেহের উপায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

—হ্যাঁ।

— সন্দেহ অমলকেও ত হতে পারে।

—তা পারে।

ম্যাজিস্টেট অমলকে বলেন—আপনি গত দু-তিন মাস কোথায় ছিলেন।

—আমি ছুটিতে আছি।

—ছুটি নিয়েছিলেন কেন?

—মন খারাপ বলে।

—আচ্ছা মিঃ বোসের মেয়েকে আপনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তিনি আপনাকে চড় মেরে ছিলেন?

—মিথ্যা নয়।

—আপনি জানেন তিনি নিরুদ্দিষ্ট।

—জানি।

ম্যাজিস্ট্রেট আর কিছু বলেন না।

অমলের আগে একজন উকিল দিয়েছিল চপলা। সে উঠে বলে—তার আসামীর জামিনের জন্য আমি আপিল করছি।

—এখন জামীন হবে না।

এমন সময় পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে দীপক আর বন্দী কমলেশ আদালতে প্রবেশ করে।

পুলিশ অফিসার বলে—ওকে জামীন দিতে পারেন স্যার।

—কেন?

—ইনি হচ্ছেন এই কেসের আসামী। মিঃ গুপ্ত আর মিঃ বোসের হত্যাকারী।

—মিঃ বোসকে হত্যা করা হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—প্রমাণ?

—ইনি সব প্রমাণ দেবেন।

পুলিশ অফিসার দীপককে দেখায়।

দীপক তখন একে একে সব ঘটনা বলে। কমলেশ মিঃ গুপ্তকে খুন করে এবং মিঃ বোসকে খুনের মাংসগুলো নিজের ফ্ল্যাটের বাইরে নিয়ে গিয়ে পুঁতে ফেলে। জীব জন্তুর হাড় কিছু কিনে হাড়গুলো মিঃ বোসের সঙ্গে মিশিয়ে দোকানে নিয়ে বিক্রি করে দেয়

অমলের জামীন মঞ্জুর হয়।

* * *

কয়েক মাস পর কমলেশের প্রতি যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ড হয়।

তারপর চপলার সঙ্গে অমলের। বিয়ের সংবাদ সব খবরের কাগজেই প্রকাশিত হয়েছিল।

॥ তেরো ॥

দিলীপ তার প্রাইভেট্ রুমে বসে একের পর এক সিগারেট ধ্বংশ সাধন করতে লাগল।

রতন ওর পাশেই বসেছিল কিন্তু সে ওর সাথে কোনরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'ল না। কারণ সে জানে যে দীপক এখন গভীর চিন্তায় মগ্ন আছে।

এমন সময় ফোন বেজে উঠল। ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—

রতন এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরল—হ্যালো, রতনলাল স্পিকিং।

—আমি অজিত বোস কথা বলছি।

—বলুন

—দীপকবাবু আছেন?

—আছেন।

—আচ্ছা, আমি এখুনি আপনাদের ওখানে আসছি।

—আচ্ছা

দীপক এবার রতনকে জিজ্ঞেস করল—কে ফোন করেছিল রে রতন?

—অজিতবাবু। তিনি এখুনি এখানে আসছেন তোমার সাথে দেখা করতে।

—আমি এই রকমই একটা কিছু আশা করেছিলাম।

—তাহ'লে তো তুই এটাও অনুমান করেছিস যে কি জন্য অজিত বাবু তোর কাছে আসছে।

—সবটা অনুমান না করলেও কিছুটা বুঝতে পেরেছি।

এমন সময় বাইরে একখানা মোটরের আসবার আওয়াজ পাওয়া গেল।

দীপক বললে—বোধ হয় অজিত বাবু এলেন।

এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন অজিতবাবু।

—কি ব্যাপার? বসবার জন্ত নির্দেশ দিয়ে দীপক বললে।

অজীতবাবু তার পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে দীপকের দিকে এগিয়ে দেয়—দীপক সেখানা পড়ে তার কাছে ফেরৎ দিয়ে বললে—আমি এরূপই একটা কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—কি করে বুঝলেন যে আমি এরূপ একখানা চিঠি পেতে পারি?

—কারণ, আজ পর্যন্ত যতগুলো লোক অপরাধ করেছে তাদের অর্ধেকেরও বেশীর ভাগ লোক এইভাবে যেচে তাদের অপরাধের পথ আরও সুগম করে তুলেছে। তাদের জন্তই তাদের ধ্বংশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—কিন্তু আমি এখন কি করি?

—আপনার কোন ভয় নেই। আমি যখন আপনার এই কেসের সব ভার গ্রহণ করছি তখন আর আপনার কোন ভয় নেই। তবে আপনি একটু সাবধানে থাকবেন।

—আচ্ছা

আর দু' একটা কথা বলে অজিতবাবু তার বাড়ার দিকে পা বাড়ালেন।

দূরের গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো ঘন্টা বেজে গেল।

দেখা গেল দুটি কালো স্যুট পরিহিত লোক একটি বাড়ার পেছনের দিকের পাইপ বেয়ে উপরে উঠে গেল।

বাইরে কড়া পুলিশ পাহারা দেওয়া হ'য়েছে। এ দৃশ্য তাদের কারো চোখে পড়ল না।

কিন্তু পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও আর একজনের চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না এরা।

সে বিপরীত দিক দিয়ে এদের অনুসরণ করল।

কিন্তু বাড়ীর ভেতর ঢুকে সে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও লোকটির কোনরূপ হদিশ পেল না।

ক্রমে ভোরের আলো ফুটে উঠল। বিফল মনোরথ হ'য়ে বের হ'য়ে এল সে।

॥ চৌদ্দ ॥

পরদিন সকাল। বেশ একটু বেলাতে ঘুম থেকে উঠল দীপক। এত বেলা পর্যন্ত সাধারণতঃ কোনদিন ঘুমায় না সে।

রতনলাল, মিঃ গুপ্ত ও অজিতবাবু বেশ কিছুক্ষণ ধরে তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে।

হাত মুখ ধুয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে অতিথিদের দেখে একটু লজ্জিত হ'ল।

দীপককে দেখতে পেয়ে মিঃ গুপ্ত ঠাট্টা করে বললেন—কিহে দীপক রাতে কি চুরি করতে বেরিয়েছিলে নাকি?

—এক রকম সেইরূপই বটে।

—আচ্ছা।

—কাল রাতে আমি একটু অভিযানে বেরিয়েছিলাম।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—কোনরূপ হদিশ পেলে?

—না।

—তবে?

—তবে আজ আমি এ রহস্যের সমাধান করব।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—কি করে?

—আমি ওদের গোপন তথ্য জানতে পেরেছি।

—কি রকম।

সুকিস্তানের রাজা ইসমাইলের স্ত্রী জোবেদা ছিল অসমান্য সুন্দরী। কিন্তু রাজা ইস্‌মাইলের বয়সটা একটু বেশী ছিল এবং দেখতেও সে তেমন সুশ্রী ছিল না।

আর এই জোবেদা বাল্যকাল থেকে এই ইসমাইলের সামান্য একজন দরিদ্র প্রজার ছেলে হানসার সাথে গোপনে প্রণয় লীলা চালিয়ে ছিল।

জোবেদার বিয়ের পরেও সে প্রেম তাদের অক্ষুন্ন থাকে।

হানসা রাজাকে পথ থেকে সরাবার জন্য বিষ প্রয়োগে তাকে হত্যা করে তারই প্রণয়ী ও রাজার স্ত্রী জোবেদার সহায়তায়।

আর এ কাজে তারা সফলকাম হ'য়েছিল। এই কারণে যে, তারা

ঐ সময় রাজার চেহারার আর একজন লোককে পেয়েছিল। রাজাকে মেরে তাকে লুকিয়ে রেখে তারা ঐ অনুরূপ চেহারার আর একজন লোককে রাজা বলে রাজ কাজ চালাতে থাকে। তবে সেই লোকটা নামমাত্র রাজা ছিল। আসলে রাজকার্য চালাত হানসা এবং জোবেদা।

—কিন্তু তুমি এত সব তথ্য সংগ্রহ করলে কি করে?

—কাল সেই নকল রাজা আমাকে ফোনে সব জানিয়েছে।

—কিন্তু, সে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করল কেন?

—এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করল কারণ তার সাথে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে গণ্ডগোল বাধিয়েছিল।

—সে এখন কোথায়?

—সে আমাদের বাড়ীতেই।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—তাকে গ্রেপ্তার করতেই কি তোমার রাতে বাইরে কাটাতে হ'য়েছিল?

—হ্যাঁ। তবে আমি ওকে গ্রেপ্তার করতে পারব তা ভাবি নি। আমি ঐ পোড়ো বাড়ীটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবার সময় দুজনকে সেখানে ঢুকতে দেখি আর একে তাদের অনুসরণ করতে দেখি তাই একেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসি।

—কিন্তু একটা কথা তো পরিষ্কার হল না দীপক?

—কোনটা?

—এরা এই ভারতে এলই কেন? আর ঐ বাড়ীটাই বা অত দাম দিয়ে কিনতে চেয়েছিল কেন?

পাছে নকল রাজা ধরা পড়ে তাই তাকে দীর্ঘদিন ভারতে রেখে দেওয়া হয়। আর মৃত রাজাকে এখানে ঐ পোড়ো বাড়ীটায় বন্দী করে রাখা হয়।

ঐ বাড়ীটা নিলাম হ'লে ওদের অসুবিধা হবে—সব তথ্য ফাঁস হবে তাই ওরা ওটা অত দামে কিনতে চেয়েছিল।

সেইদিনই দুপুরে এদের অভিযান শুরু হ'ল।

বাইরে পুলিশ মোতায়েন রেখে মাত্র চারজন কনেষ্টবল নিয়ে ধীর পদক্ষেপে সেই পোড়ো বাড়ীটার দিকে এগিয়ে চলল দীপক ও রতন।

মিঃ গুপ্ত বাইরে দাঁড়িয়ে বাড়ির চারিদিকে পরিদর্শন করতে লাগলেন।

ঘরের ভেতর ঢুকে একতলাটা ভালো করে তন্ন তন্ন করে দেখল কিন্তু সেখানে কোন মানুষ কোনদিন কোন কালে বাস করত তার কোনরূপ অস্তিত্ব পাওয়া গেল না।

রতন বললে—মনে হচ্ছে পাখী পালিয়েছে।

—কিন্তু পাখী পালালেও তার পালক তো পাওয়া যাবে।

—তা ঠিক।

এমন সময়ে উপরে একটা কি যেন পড়বার শব্দ শোনা গেল।

ওরা অতি দ্রুত এসে হাজির হ'ল দোতলায়।

দোতলায় পৌঁছে ওরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল শব্দকে অনুসরণ করে।

কিন্তু তাদের নিরাশ করে দিল একটা কালো বিড়াল।

দীপক বললে—এই বিড়ালটাই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে এখানে মানুষ ছিল। যে ঘরের ভেতর থেকে বিড়ালটা বেরিয়ে এল ওরা ঢুকলো সেই ঘরে।

ঘরের ভেতর একখানা টেবিল আছে তার পাশে চারখানা চেয়ার।

একটা এ্যাসট্রেতে সিগারেটের অবশিষ্ট দগ্ধাবশেষ পড়ে আছে।

তাদের ভেতর থেকে একটা বার্মা সিগারেট তুলে নিয়ে দীপক বললে—এই দলের লোকগুলো যে তুর্কিস্তানের লোক তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

—কি করে?

—এই সিগারেট দেখে। আরও একটা জিনিষ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

—সেটা কি?

—এরা কালও এখানে বসে তাদের আদাব জানিয়েছিল। কালই যদি আমরা এখানে হানা দিতাম তবে আমাদের এতটা হতাশ হ'তে হ'ত না

—কিন্তু কালথেকেই তো তুমি পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেছিলে।

—তা করেছিলাম।

—কিন্তু এতগুলি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ও পালাল কি করে?

—সেটাই তো ভাববার বিষয়।

হঠাৎ একটি দেওয়ালে একটি হুইলের চাকার মত কি যেন দেখতে পেল।

সেটাকে প্রথম দর্শনে মাকড়সার জাল বলেই মনে হয়। কিন্তু সেটা তা নয়।

দীপক তার কাছে গিয়ে সেটাকে ঘোরাতেই মেঝের একটা অংশ সরে গেল।

সেখানে সে একটি কাঠের সিঁড়ি দেখতে পেল। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সে একটি গুদামের মত ছোট্ট কুঠরীতে প্রবেশ করল।

এই কুঠরীতে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

তার মধ্যস্থলে একখানা টেবিল সংস্থাপিত আছে।

টেবিলখানির উপর একখানা মলিন টেবিলক্লথ প্রসারিত রয়েছে।

টেবিলের চারদিকে কয়েকখানা চেয়ার।

কিন্তু সে কক্ষেও কোন জন মানবের সাড়া পেল না।

দীপক বুঝল এই কুঠরীটাই চোরদের পরামর্শের স্থান। এখানে বসে তারা মদ খায় ও দাঁও মারবার পরামর্শ করে।

এমন সময় একটা কুল-কুল ধ্বনি শোনা গেল।

দীপক বুঝতে পারল কাছেই কোন জায়গায় বোধ হয় কোন নদী আছে।

এমন সময় একটা ছোট্ট ক্রু আবার তাদের নজরে পড়ল।

সেটা ঘোরাতেই একটা পাটা উঠে গেল এবং দেখা গেল একটা সুড়ঙ্গ পথ সোজা নেমে গেছে নদীর দিকে।

দীপক বুঝতে পারল এই পথেই ওরা পালিয়েছে।

পনেরো

দীপক নিরাশ হ'য়ে ফিরে এল।

অজিতবাবু হতাশায় বুক চাপড়াতে লাগল। তার জীবনে এই বাড়ীটা যে এমন একটি বিপর্যয় আনবে তা সে স্বপ্নেও ভাবে নি।

অজিতবাবু দীপককে বললে—মিঃ চ্যাটার্জী আমি এরূপ জান্‌লে কোনদিনও ঐ বাড়ীটা কিনতাম না।

—ও বাড়ীটা কিনে আপনি তো ভালই করেছেন।

—আপনিও এই কথা বলছেন।

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—কারণ যে বাড়ীটা ছিল একটা শয়তানের কারখানা—যার হদিশ আমাদের পুলিশ বিভাগ কোনদিনও করতে পারত না—সেই বাড়ীটা আপনি কিনেছিলেন বলেই অজানিত রহস্য আজ সকলে জানতে পারল।

—কিন্তু আমার যে কি ক্ষতি হ'য়ে গেল তা আপনি কি কিছুই বুঝতে পারছেন না ?

—খুবই বুঝতে পারছি।

—জানেন মৃদুলা আমার জন্যেই আজ এরূপ বিপদে পড়েছে।

—আপনাকে তো আমি বলেছি অজিতবাবু, দীপক চ্যাটার্জী তার এখনও কোনদিন কোন কাজে অসাফল্য হয় নি। আমি যে কাজে একবার হাত দিই তা শেষ না করে ছাড়ি না।

—কিন্তু আমার যে বড্ড ভয় হচ্ছে। যদি তারা মৃদুলার উপরে কোনরূপ অত্যাচার করে।

—আমি তা হ'তে দেব না। আপনি নির্ভয়ে ফিরে যান। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি তিনদিনের মধ্যে আমি আপনার অপরাধীকে আপনার সামনে এনে দেব।

বেশ বিমর্ষ হ'য়ে অজিতবাবু চলে গেল।

দীপক চিন্তাযুক্ত চিত্তে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করল।

দীপক যখন ওদের গ্রেপ্তার করবার পরিকল্পনা করছিল।

ঠিক তখনই এদের বিরুদ্ধ পক্ষ একটা জঙ্গলের ভিতর দ্বিতল

অট্টালিকার ভিতর বসে নানারূপ পরিকল্পনা করছিল।

দলের বড় পান্‌ডা হান্‌সা বললে—এখন কি করা যায় রুস্তম?

রুস্তম বললে—আমি একটা কথা বলব?

—কি?

—আমাদের প্রথমে উচিত আমাদের সাথে যে এরূপ ব্যবহার করল সেই বিশ্বাস ঘাতককে শেষ করে দেওয়া।

—কিন্তু তাকে শেষ করলেই তো আর আমাদের সব সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে না।

—তা ঠিক।

—তবে?

—এখন আমাদের উচিত দীপক চ্যাটার্জীকে পথ থেকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া।

—তাও কি কখনো সম্ভব?

—কেন না।

—বেশ সে ভার আমি তোমাকে দিচ্ছি রুস্তম।

—বেশ।

রুস্তম বেরিয়ে গেলে এদের দলপতি বললে—এই আস্তানাটা সবচেয়ে নিরাপদ।

—তা যা বলেছ।

বিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এসে বললে—আচ্ছা একটা কাজ করলে কেমন হয়?

—কি?

—যদি আমরা অজিত বাবুকে এখানে ধরে নিয়ে আসি।

—অজিতবাবু, সে কে ?

—যে ভদ্রলোক ঐ বাড়ীটা কিনেছেন।

—মানে মিঃ বোস ?

—হ্যাঁ

—তা সম্ভব হ'তে পারে।

—তাহ'লে তাইই করা যাক।

* *

সেইদিন রাতে। অজিত বোস তার ডায়রী লিখছিলেন। এমন সময় ধীরে ধীরে এগিয়ে এল একজন কালো মুখোশধারী লোক।

অজিতবাবু কিছু বুঝে ওঠবার আগেই শক্তিশালী দুখানা হাত একখানা ক্লোরোফর্ম মাখানো রুমাল তার নাকে চেপে ধরল।

কোন কিছু করবার আগে তিনি জ্ঞান হারালেন।

সে অবলীলাক্রমে তাকে ঘাড়ে করে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

* * *

পরদিন সকাল। দীপক তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং।

বিরক্তিকর মেজাজ নিয়ে দীপক এগিয়ে গেল ফোনের কাছে।

দীপক চ্যাটার্জী স্পীকিং।

—আমি মিঃ গুপ্ত কথা বলছি।

—বলুন, কি ব্যাপার।

—কাল রাতে, কে বা কারা অজিতবাবুকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

—বলেন কি ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আমি আসছি।

দীপক মিনিট কুড়ির মধ্যেই গিয়ে হাজির হ'ল লালবাজার থানায়।

দীপককে সাদরে আপ্যায়ন করলেন মিঃ গুপ্ত।

মিঃ গুপ্ত চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেন—আমি তো এর মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝছি না।

—আমি কিন্তু কিছু বুঝছি।

—তুমি বুঝছ।

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা অনর্থক অজিতবাবুর ঐ পোড়ো বাড়ীটার সামনে অতগুলি পুলিশ মোতায়েন রাখা কি ঠিক হচ্ছে।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু ওখানে তো কিছু নেই—তবে ওখানে পুলিশ মোতায়েন রাখবার কথা বললে কেন ?

—কারণ আছে মিঃ গুপ্ত।

—সেটা কি ?

—তবে শুনুন আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। শুনুন ঐ বাড়ীটাতে তারা তাদের মৃত রাজার লাশ লুকিয়ে রেখেছিল।

—কিন্তু এতদিন সে লাশ ওখানে থাকলে কি করে ?

—তারা নানারূপ ওষুধ দিয়ে তাকে এখন কদিন তাজা রাখবে।

—কেন ?

—কারণ দেশে নিয়ে দেখাবে তাদের দ্বিতীয় রাজাও মারা গেছে আরতারা তাদের লাশ নিয়ে এসেছে।

—এতে ওদের লাভ

—এতে করে, ওদের ভেতর যে কোন একজন রাজা হতে পারবে।

—কিন্তু সে লাশ গেল কোথায়?

—সে লাশটা ভেতরেই আছে।

—ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে—কি বল?

—হ্যাঁ।

—ঐ বাড়ীটার ভিতর আর কি কিছু আছে বলে তোমার মনে হয় না?

—হ্যাঁ।

—কি থাকতে পারে বলে তোমার বিশ্বাস?

—আমার মনে হয় কিছু টাকা কড়িও ওখানে আছে।

—তা হ'তে পারে।

দীপক মিঃ গুপ্তকে পুলিশ ফৌজ তৈরী রাখতে বলে বেরিয়ে গেল।

সেই দিনই দেখা গেল আর একটি অদ্ভুত কাণ্ড।

যে পেড়ো বাড়ীটার সামনে পুলিশ মোতায়েন হ'য়েছিল—সেখান থেকে পুলিশ উঠিয়ে নেওয়া হ'ল।

আর দীপক সেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে অবশেষে কক্ষটি গুপ্ত কক্ষ থেকে বের করল সেই মৃত রাজার লাশ।

অতএব চক্রান্তকারীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

বাড়ীতে ফিরে এসে দীপক একখানা চিঠি পেল।

সেখানা লিখে অজিত বোস।

সে লিখেছে।

প্রিয় দীপক বাবু—

আমার জীবন সংশয় হয়ে উঠেছে। ওরা আমাকেও বন্দী করেছে। যদি আপনি আমার কেনা ঐবাড়ীটার পাশে মোতায়েন রাখা পুলিশ না সারিয়ে নেন এবং এবং এদের পেছন থেকে না সরে দাঁড়ান তবে আমার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন।

ইতি—অজিত বোস।

দীপক বুঝতে পারল ঐ বাড়ীটা থেকে পুলিস সরিয়ে নিয়ে সে একটা বিষয়ে খুব ভাল করেছে।

পুলিশ সরিয়ে নিলেও সাদা পোষাকে বাড়ীর চারপাশে পিস্তলধারী পুলিশ সে রেখে দিয়েছিল।

এর পরে একদিন দেখা গেল দীপকলক্ষ নিয়ে নদীর ওপারের দিকে পোড়ো বাড়িটার দিকে গেল।

দীপক বাড়ীটার চারদিকে পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলল।

কৌতূহলী জনতাও সেখানে ভীড় করল, রহস্য সন্ধানী দীপকেও তার আবিষ্কৃত রহস্যকে জানবার ও দেখবার মানসে।

ঘন্টাখানেক বাড়ীটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দীপক আবিষ্কার করল, এক বাক্স চোলাই মদ, গাঁজা, আউন্স এবং অজিত ও মৃদুলাকে।

দীপক বুঝতে পারল ওরা এখান থেকে এইসব মাল বাইরে রপ্তানি করে বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করছিল।

দীপকের এই বাড়ীতে হানা দেবার একটা উদ্দেশ্য ছিল।

দীপক জানতো এই বাড়ীটাতে সে ওদের পাবে না।

কারণ তারা কোনরূপ দুর্নিতীমূলক কাজ করে দীপকের দৃষ্টি ঐ অজিত বোসের বাড়ীটা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়।

তার মানেই হ'ল ঐ পোড়ো বাড়ীটাতে তাদের সব কিছু আছে।

তাই দীপক এখানে একা এসে ওখানে মিঃ গুপ্ত ও রতনকে ছদ্মবেশে ঐ বাড়ীটার উপর নজর রাখতে বলে এসেছিল।

দীপকের অনুমান ভুল হ'ল না। রতন ও মিঃ গুপ্ত যখন বিরক্ত হ'য়ে বাড়ীটার উপর নজর রাখবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে চলে যাবার মতলব আটছিল তখন দেখল, দুটি লোক ঐ বাড়ীটা থেকে দুটি সুটকেস নিয়ে বের হচ্ছে।

সম্ভবতঃ এরা ভিতরের দিকেই ছিল।

কিন্তু না ওরা নদী পথে এসে এদের অলখ্যে ঐ বাড়ীটাতে এসে ঢুকেছিল। দীপক ঐ নদীপথে এসে ওদের গোপন পথে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেয়েই ওরা সোজা পথে বেরোতে গেল।

ওদের মনে হ'য়েছিল যে, স্বয়ং দীপক চাটার্জী যখন নদীর মুখে পাহারা দিচ্ছে তখন আর বাড়ীর সামনে কোন লোক নেই।

তাদের এই ভুল ক্যালকুলেশনের ফলে তারা অনায়াসেই মিঃ গুপ্ত ও রতনের হাতে ধরা পড়ল।

বিচারে এদের প্রত্যেকের দশ বছর করে জেল হ'ল এবং নকল রাজা রাজ সাক্ষী হওয়ায় তার তিন বছরের জেল হ'ল।

সমাপ্ত

'অবলা প্রেস' ১/এ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬,
গোপীনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত